সাবা

৩৪

নামকরণ

১৫ আয়াতের বাক্য لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এটি এমন একটি সূরা যেখানে 'সাবা'–এর কথা বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে এর নাযিলের সঠিক সময়–কাল জানা যায় না। তবে বর্ণনাধারা থেকে অনুভূত হয়, সেটি ছিল মক্কার মাঝামাঝি যুগ অথবা প্রাথমিক যুগ। যদি মাঝামাঝি যুগ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত সেটি ছিল তার একেবারে প্রথম দিককার সময়। তখনো পর্যন্ত জুলুম–নিপীড়নের তীব্রতা দেখা দেয়নি এবং তখনো কেবলমাত্র ঠাট্টা–তামাশা, বিদ্রূপ, গুজব ছড়ানো এবং মিথ্যা অপবাদ ও প্ররোচনা দেবার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে দমিত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

এ সূরায় কাফেরদের এমন সব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে যা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ও আখেরাতের দাওয়াতের এবং তাঁর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাংগ–বিদ্রূপ ও অর্থহীন অপবাদের আকারে পেশ করতো। কোথাও এ আপত্তিগুলো উদ্ধৃত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে আবার কোথাও সেগুলো কোন্ আপত্তির জবাব তা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জবাব গুলো দেয়া হয়েছে বুঝাবার পদ্ধতিতে এবং আলোচনার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেবার ও যুক্তিপ্রদর্শনের কায়দায়। কিন্তু কোথাও কোথাও কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতার খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলাইমান (আ) ও সাবা জাতির কাহিনী এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমাদের সামনে ইতিহাসের এ দু'টি দৃষ্টান্তই রয়েছে ঃ একদিকে রয়েছে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলাইমান (আ)। আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছিলেন বিপুল শক্তি এবং এমন গৌরব দীপ্ত শান–শওকত, যা ইতিপূর্বে খুব কম লোককে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব কিছু পাওয়ার পরও তাঁরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হননি। বরং নিজের রবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিবর্তে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হন। অন্যদিকে ছিল সাবা জাতি। যখন আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত দান করলেন, তারা অহমিকায় স্ফীত হয়ে উঠলো এবং শেষে

এমনভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো যে, এখন কেবল তাদের কাহিনীই দুনিয়ার বুকে রয়ে গেছে। এ দু'টি দৃষ্টান্ত সামনে রেখে স্বয়ং তোমাদেরকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, তাওহীদ ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে ওঠে তা বেশী ভালো, না সেই জীবন বেশী ভালো যা গড়ে ওঠে কুফর ও শিরক এবং আখেরাত অস্বীকার ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার ভিত্তিতে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ② وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ③

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক[১] এবং আখেরাতে প্রশংসা তাঁরি জন্য।[২] তিনি বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।[৩] যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বের হয়, যা কিছু আকাশ থেকে নামে এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয় প্রত্যেকটি জিনিস তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল।[৪]

অস্বীকারকারীরা বলে, কি ব্যাপার কিয়ামত আমাদের ওপর আসছে না কেন![৫] বলো, আমার অদৃশ্য জ্ঞানী পরওয়ারদিগারের কসম, তা তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে।[৬] তাঁর কাছ থেকে অণু পরিমাণ কোন জিনিস আকাশসমূহেও লুকিয়ে নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। অণুর চেয়ে বড়ই হোক, কিংবা তার চেয়ে ছোটই হোক, — সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।[৭]

১. মূলে 'হাম্‌দ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এখানে এ দু'টি অর্থই প্রযুক্ত। আল্লাহ যখন

বিশ্ব-জাহান ও এর সমস্ত জিনিসের মালিক তখন অবশ্যই এ বিশ্ব-জাহানে সৌন্দর্য, পূর্ণতা, জ্ঞান, শক্তি, শিল্পকারিতা ও কারিগরির যে শোভা দৃষ্টিগোচর হয় এসবের জন্য একমাত্র তিনিই প্রশংসার অধিকারী। আর এ বিশ্ব-জাহানে বসবাসকারী যে কেউ যে কোন জিনিস থেকে লাভবান হচ্ছে বা আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করছে সে জন্য তার আল্লাহর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অন্য কেউ যখন এসব জিনিসের মালিকানায় শরীক নেই তখন প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা লাভ করার অধিকারও অন্য কারো নেই।

২. অর্থাৎ যেভাবে এ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত তিনিই দান করেছেন, ঠিক তেমনি আখেরাতেও মানুষ যা কিছু পাবে তা তাঁরই ভাণ্ডার থেকে এবং তাঁরই দান হিসেবেই পাবে। তাই সেখানেও একমাত্র তিনিই হবেন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী।

৩. অর্থাৎ তাঁর সমস্ত কাজই হয় পূর্ণজ্ঞান ও প্রজ্ঞা ভিত্তিক। তিনি যা করেন একদম ঠিকই করেন। নিজের প্রত্যেকটি সৃষ্টি কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে, তার প্রয়োজন কি, তার প্রয়োজনের জন্য কি উপযোগী, এ পর্যন্ত সে কি করেছে এবং সামনের দিকে আরো কি করবে—এসব সম্পর্কে তিনি পূর্ণজ্ঞান রাখেন। নিজের তৈরি দুনিয়া সম্পর্কে তিনি বেখর নন বরং প্রতিটি অণু-পরমাণুর অবস্থাও তিনি পুরোপুরি জানেন।

৪. অর্থাৎ তাঁর রাজ্যে কোন ব্যক্তি বা দল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও যদি পাকড়াও না হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ এ নয় যে, এ দুনিয়ায় নৈরাজ্য চলছে এবং আল্লাহ এখানকার ক্ষমতাহীন রাজা। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ করুণাশীল এবং ক্ষমা করাই তাঁর অভ্যাস। পাপী ও অপরাধীকে অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই পাকড়াও করা, তার রিযিক বন্ধ করে দেয়া, তার শরীর অবশ করে দেয়া, মুহূর্তের মধ্যে তাকে মেরে ফেলা, সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কিন্তু তিনি এমনটি করেন না। তাঁর করুণাগুণের দাবী অনুযায়ী তিনি এটি করেন। সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নাফরমান বান্দাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকেন। তাদেরকে আপন আচরণ শুধরে নেবার অবকাশ দেন এবং নাফরমানি থেকে বিরত হবার সাথেসাথেই মাফ করে দেন।

৫. ঠাট্টা-মস্করা করে চিবিয়ে চিবিয়ে তারা একথা বলে। তাদের একথা বলার অর্থ ছিল এই যে, বহুদিন থেকে এ পয়গম্বর সাহেব কিয়ামতের আগমনী সংবাদ দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু জানি না আসতে আসতে তা আবার থেমে গেলো কোথায়। আমরা তার প্রতি এতই মিথ্যা আরোপ করলাম, এত গোস্তাখী করলাম, তা নিয়ে এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলাম কিন্তু এরপরও সেই কিয়ামত কোনভাবেই আসছে না।

৬. পরওয়ারদিগারের কসম খেয়ে তাঁর জন্য "অদৃশ্য জ্ঞানী" বিশেষণ ব্যবহার করার দ্বারা স্বতস্ফূর্তভাবে এ দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের আগমন তো অবধারিত কিন্তু তার আগমনের সময় অদৃশ্যজ্ঞানী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এ বিষয়টিই কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ১৮৭, তা-হা ১৫, লুকমান ৩৪, আল আহযাব ৬৩, আল মুলক ২৫-২৬ এবং আন নাযি'আত ৪২-৪৪ আয়াত।

لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي
أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ
مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ
جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾

আর এ কিয়ামত এ জন্য আসবে যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন, তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিয্ক। আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৮] *হে নবী! জ্ঞানবানরা ভালো করেই জানে, যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা পুরোপুরি সত্য এবং তা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখায়।*[৯]

অস্বীকারকারীরা লোকদেরকে বললো, "আমরা বলবো তোমাদেরকে এমন লোকের কথা যে এই মর্মে খবর দেয় যে, যখন তোমাদের শরীরের প্রতিটি অণু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হবে, নাজানি এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা তৈরি করে, নাকি তাকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছে।"[১০]

না, বরং যারা আখেরাত মানে না তারা শাস্তি লাভ করবে এবং তারাই রয়েছে ঘোরতর ভ্রষ্টতার মধ্যে।[১১]

৭. আখেরাতের সম্ভাবনার সপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করা হয় এটি তার অন্যতম। যেমন সামনের দিকে ৭ আয়াতে আসছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যেসব কারণে মৃত্যুপরের জীবনকে যুক্তি বিরোধী মনে করতো তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে, যখন সমস্ত মানুষ মরে মাটিতে মিশে যাবে এবং তাদের দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলোও চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তখন এ অসংখ্য অংশের আবার কিভাবে একত্র হওয়া সম্ভব

হবে এবং এগুলোকে এক সাথে জুড়ে আবার কেমন করে তাদেরকে সেই একই দেহাবয়বে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। একথা বলে এ সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে যে, আল্লাহর দপ্তরে এসব লিখিত আছে এবং আল্লাহ জানেন কোন্ জিনিসটি কোথায় গেছে। যখন তিনি পুনর্বার সৃষ্টি করার সংকল্প করবেন তখন তাঁর পক্ষে প্রতিটি ব্যক্তির দেহের অংশগুলো একত্র করা মোটেই কষ্টকর হবে না।

৮. ওপরে আখেরাতের সম্ভাবনার যুক্তি পেশ করা হয়েছিল এবং এখানে তার অপরিহার্যতার যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সময় অবশ্যই আসা উচিত যখন জালেমদেরকে তাদের জলুমের এবং সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে। যে সৎকাজ করবে সে পুরস্কার পাবে এবং যে খারাপ কাজ করবে সে শাস্তি পাবে, সাধারণ বিবেক–বুদ্ধি এটা চায় এবং এটা ইনসাফেরও দাবী। এখন যদি তোমরা দেখো, বর্তমান জীবনে প্রত্যেকটি অসৎলোক তার অসৎকাজের পুরোপুরি সাজা পাচ্ছে না এবং প্রত্যেকটি সৎলোক তার সৎকাজের যথার্থ পুরস্কার লাভ করছে না বরং অনেক সময় অসৎকাজ ও সৎকাজের উল্‌টো ফলাফল পাওয়া যায়, তাহলে তোমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, যুক্তি, বিবেক–বুদ্ধি ও ইনসাফের এ অপরিহার্য দাবী একদিন অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। সেই দিনের নামই হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। তার আসা নয় বরং না আসাই বিবেক ও ইনসাফের বিরোধী।

এ প্রসংগে ওপরের আয়াত থেকে আর একটি বিষয়ও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে, ঈমান ও সৎকাজের ফল হচ্ছে গোনাহের মার্জনা ও সম্মানজনক রিযিক লাভ এবং যারা আল্লাহর দীনকে হেয় করার জন্য বিদ্বিষ্ট ও শত্রুতামূলক প্রচেষ্টা চালাবে তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম শাস্তি। এ থেকে আপনা আপনিই একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাচ্চা দিলে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে তার কাজের মধ্যে যদি কিছু গলদও থাকে তাহলে সে সম্মানজনক রিযিক না পেয়ে থাকলেও মাগফিরাত থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে না। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে কিন্তু আল্লাহর সত্য দীনের মোকাবিলায় বিদ্বেষমূলক ও বৈরী নীতি অবলম্বন করবে না সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না ঠিকই কিন্তু নিকৃষ্টতম শাস্তি তার জন্য নয়।

৯. অর্থাৎ এ বিরোধীরা তোমার উপস্থাপিত সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যতই জোর দিক না কেন তাদের এসব প্রচেষ্টা ও কৌশল সফলকাম হতে পারবে না। কারণ এসব কথার মাধ্যমে তারা কেবলমাত্র মূর্খদেরকেই প্রতারিত করতে পারবে। জ্ঞানবানরা তাদের প্রতারণাজালে পা দেবে না।

১০. কুরাইশ সরদাররা একথা ভালোভাবে জানতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যুক বলে মেনে নেয়া জনগণের জন্য ছিল বড়ই কঠিন। কারণ সমগ্র জাতি তাঁকে সত্যবাদী জানতো এবং সারা জীবনেও কখনো কেউ তাঁর মুখ থেকে একটি মিথ্যে কথা শোনেনি। তাই তারা লোকদের সামনে তাঁর প্রতি এভাবে দোষারোপ করতোঃ এ ব্যক্তি যখন মৃত্যু পরের জীবনের মতো অবাস্তব কথা মুখে উচ্চারণ করে চলেছে, তখন হয় সে (নাউযুবিল্লাহ) জেনে বুঝে একটি মিথ্যে কথা বলছে নয়তো সে পাগল। কিন্তু এ পাগল কথাটিও ছিল মিথ্যুক কথাটির মতই সমান ভিত্তিহীন ও উদ্ভট। কারণ একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাগল বলা কেবল একজন নিরেট মূর্খ ও নির্বোধ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ⑨

তারা কি কখনো এ আকাশ ও পৃথিবী দেখেনি যা তাদেরকে সামনে ও পেছন থেকে ঘিরে রেখেছে? আমি চাইলে তাদেরকে যমীনে ধসিয়ে দিতে অথবা আকাশের কিছু অংশ তাদের ওপর নিক্ষেপ করতে পারি।[১২] আসলে তার মধ্যে রয়েছে একটি নির্দশন এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য যে আল্লাহ অভিমুখী হয়।[১৩]

ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। নয়তো চোখে দেখেইবা এক ব্যক্তি একটি জ্যান্ত মাছি গিলে খেয়ে নিতো কেমন করে। এ কারণেই আল্লাহ এ ধরনের বাজে কথার জবাবে কোন প্রকার যুক্তি উপস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং তারা মৃত্যুপরের জীবন সম্পর্কে যে বিস্ময় প্রকাশ করতো কেবলমাত্র তা নিয়েই কথা বলেছেন।

১১. এ হচ্ছে তাদের কথার প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, মূর্খের দল! তোমরা তো বিবেক বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসেছ। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানাচ্ছে তার কথা মেনে নিচ্ছো না এবং সোজা যে পথটি জাহান্নামের দিকে চলে গেছে সেদিকেই চোখ বন্ধ করে দৌড়ে চলে যাচ্ছো কিন্তু তারপরও তোমাদের নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে বাঁচাবার চিন্তা করছে উল্টা তাকেই তোমরা পাগল আখ্যায়িত করছো।

১২. এটা তাদের কথার দ্বিতীয় জবাব। এ জবাবটি অনুধাবন করতে হলে এ সত্যটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখতে হবে যে, কুরাইশ কাফেররা যেসব কারণে মৃত্যুপরের জীবনকে অস্বীকার করতো তার মধ্যে তিনটি জিনিস ছিল সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট। এক, তারা আল্লাহর হিসেব-নিকেশ এবং তাঁর কাছে জবাবদিহির ব্যাপারটি মেনে নিতে চাইতো না। কারণ এটা মেনে নিলে দুনিয়ায় তাদের ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতা থাকতো না। দুই, তারা কিয়ামত হওয়া, বিশ্ব ব্যবস্থায় ওলট পালট হয়ে যাওয়া এবং পুনরায় একটি নবতর বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটাকে অকল্পনীয় মনে করতো। তিন, যারা শত শত হাজার হাজার বছর আগে মরে গেছে এবং যাদের হাড়গুলোও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মাটিতে, বাতাসে ও পানিতে মিশে গেছে তাদের পুনর্বার প্রাণ নিয়ে সশরীরে বেঁচে ওঠা তাদের কাছে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার মনে হতো। ওপরের জবাবটি এ তিনটি দিককেই পরিবেষ্টন করেছে এবং এ ছাড়াও এর মধ্যে একটি কঠোর সতর্কবাণীও নিহিত রয়েছে। এ ছোট ছোট বাক্যগুলোর মধ্যে যে বিষয়বস্তু লুকিয়ে রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ যদি তোমরা কখনো চোখ মেলে এ পৃথিবী ও আকাশের দিকে তাকাতে তাহলে দেখতে পেতে এসব খেলনা নয় এবং এ ব্যবস্থা ঘটনাক্রমে সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এ

বিশ্ব–জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস একথা প্রকাশ করছে যে, একটি সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন সত্তা পূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে তাকে তৈরি করেছেন। এ ধরনের একটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অধীনে এখানে কাউকে বুদ্ধি, বিবেক, বিচারশক্তি ও স্বাধীন ক্ষমতা দান করার পর তাকে অদায়িত্বশীল ও কারো কাছে কোনপ্রকার জবাবদিহি না করে এমনি ছেড়ে দেয়া যেতে পারে বলে ধারণা করা একেবারেই অযৌক্তিক ও অর্থহীন কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুই ঃ গভীর দৃষ্টিতে এ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে কিয়ামতের আগমন যে মোটেই কোন কঠিন ব্যাপার নয়, সে কথা যে কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবে। পৃথিবী ও আকাশ যেসব নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সামান্য একটু হেরফের হলে কিয়ামত ঘটে যেতে পারে। আর এ ব্যবস্থাই আবার একথারও সাক্ষ দেয় যে, যিনি আজ এ দুনিয়া–জাহান তৈরি করে রেখেছেন তিনি আবার অন্য একটি দুনিয়াও তৈরি করতে পারেন। এ কাজ যদি তাঁর জন্য কঠিন হতো তাহলে এ দুনিয়াটিই বা কেমন করে অস্তিত্ব লাভ করতো।

তিন ঃ তোমরা পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টাকে কী মনে করেছো? তাঁকে তোমরা মৃত মানব গোষ্ঠীকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে অক্ষম বলে মনে করছো? যারা মরে যায় তাদের দেহ পচে খসে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যতই দূরে ছড়িয়ে পড়ুক না কেন সেগুলো থাকে তো এ আকাশ ও পৃথিবীর সীমানার মধ্যেই। এর বাইরে তো চলে যায় না। তাহলে এ পৃথিবী ও আকাশ যে আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন রয়েছে তাঁর পক্ষে মাটি, পানি ও হাওয়ার মধ্যে সেখানে যে জিনিস প্রবেশ করে আছে সেখান থেকে তাকে টেনে বের করে আনা এমন আর কি কঠিন ব্যাপার। তোমাদের শরীরের মধ্যে এখন যা কিছু আছে, তাও তো তাঁরই একত্রিত করা এবং ঐ একই মাটি, পানি ও হাওয়া থেকে বের করে আনা হয়েছে। এ বিচ্ছিন্ন অংশগুলো সংগ্রহ করা যদি আজ সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে আগামীকাল কেন অসম্ভব হবে?

এ তিনটি যুক্তিসহ এ বক্তব্যের মধ্যে আরো যে সতর্কবাণী নিহিত রয়েছে, তা এই যে, তোমরা সব দিক থেকে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের আবেষ্টনীতে ঘেরাও হয়ে আছো। যেখানেই যাবে এ বিশ্ব–জাহান তোমাদের ঘিরে রাখবে। আল্লাহর মোকাবিলায় কোন আশ্রয়স্থল তোমরা পাবে না। অন্যদিকে আল্লাহর ক্ষমতা এতই অসীম যে, যখনই তিনি চান তোমাদের পায়ের তলদেশ বা মাথার ওপর থেকে যে কোন বিপদ আপদ তোমাদের প্রতি বর্ষণ করতে পারেন। যে ভূমিকে মায়ের কোলের মতো প্রশান্তির আধার হিসেবে পেয়ে তোমরা সেখানে গৃহ নির্মাণ করে থাকো, তার উপরিভাগের নীচে কেমন সব শক্তি কাজ করছে এবং কখন তিনি কোন্ ভূমিকম্পের মাধ্যমে এ ভূমিকে তোমাদের জন্য কবরে পরিণত করবেন তা তোমরা জানো না। যে আকাশের নিচে তোমরা এমন নিশ্চিন্তে চলাফেরা করছো যেন এটা তোমাদের নিজেদের ঘরের ছাদ, তোমরা জানো না এ আকাশ থেকে কখন কোন্ বিজলী নেমে আসবে অথবা কোন্ প্রলয়ংকর বর্ষার ঢল নামবে কিংবা কোন্ আকস্মিক বিপদ তোমাদের ওপর আপতিত হবে। এ অবস্থায় তোমাদের এ আল্লাহকে ভয় না করা, পরকালের ভাবনা থেকে এভাবে গাফেল হয়ে যাওয়া এবং একজন শুভাকাংখীর উপদেশের মোকাবিলায় এ মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়ার এ ছাড়া আর কি অর্থ হতে পারে যে, তোমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনছো।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿١٠﴾ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

দাউদকে আমি নিজের কাছ থেকে বিরাট অনুগ্রহ দান করেছিলাম।[১৪] (আমি হুকুম দিলাম) হে পর্বতমালা! এর সাথে একাত্মতা করো (এবং এ হুকুমটি আমি) পাখিদেরকে দিয়েছি।[১৫] আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি এ নির্দেশ সহকারে যে, বর্ম নির্মাণ করো এবং তাদের পরিমাপ যথার্থ আন্দাজ অনুযায়ী রাখো।[১৬] (হে দাউদের পরিবার!) সৎকাজ করো, তোমরা যা কিছু করছো সবই আমি দেখছি।

১৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ধরনের বিদ্বেষ ও অন্ধ স্বার্থপ্রীতি দুষ্ট নয়, যার মধ্যে কোন জিদ ও হঠকারিতা নেই বরং যে আন্তরিকতা সহকারে তার মহান প্রতিপালকের কাছে পথনির্দেশনার প্রত্যাশী হয়, সে তো আকাশ ও পৃথিবীর এ ব্যবস্থা দেখে বড় রকমের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যার মন আল্লাহর প্রতি বিমুখ সে বিশ্ব–জাহানে সবকিছু দেখবে তবে প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিতকারী কোন নিদর্শন সে অনুভব করবে না।

১৪. মহান আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি যে অসংখ্য অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বাইতুল লাহমের ইয়াহুদা গোত্রের একজন সাধারণ যুবক। ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জালুতের মতো এক বিশাল দেহী ভয়ংকর শত্রুকে হত্যা করে তিনি রাতারাতি বনী ইসরাঈলের নয়নমণিতে পরিণত হন। এ ঘটনা থেকেই তাঁর উত্থান শুরু হয়। এমনকি তালুতের ইন্তিকালের পরে প্রথমে তাঁকে 'হাবৃরূনে' (বর্তমান আল খালীল) ইয়াহুদিয়ার শাসনকর্তা করা হয়। এর কয়েক বছর পর সকল বনী ইসরাঈল গোত্র সর্বসম্মতভাবে তাঁকে নিজেদের বাদশাহ নির্বাচিত করে এবং তিনি জেরুসালেম জয় করে ইসরাঈলী রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। তাঁরই নেতৃত্বে ইতিহাসে প্রথমবার এমন একটি আল্লাহর অনুগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার সীমানা আকাবা উপসাগর থেকে ফোরাত নদীর পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব অনুগ্রহের সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে আরো দান করেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, আল্লাহভীতি, আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর প্রতি আনুগত্যশীলতা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল বাকারাহ, ২৭৩ টীকা এবং বনী ইসরাঈল, ৭ টীকা)

১৫. এর আগে এ বিষয়টি সূরা আম্বিয়ার ৭৯ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭১ টীকা)

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ
وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ
اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ
وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْۤا اٰلَ
دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾

আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে বশীভূত করে দিয়েছি, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত।[১৭] *আমি তার জন্য গলিত তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করি।*[১৮] *এবং এমন সব জিনকে তার অধীন করে দিয়েছে যারা তাদের রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো।*[১৯] *তাদের মধ্য থেকে যে আমার হুকুম অমান্য করে তাকে আমি আস্বাদন করাই জলন্ত আগুনের স্বাদ। তারা তার জন্য তৈরি করতো যা কিছু সে চাইতো, উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি,*[২০] *বড় বড় পুকুর সদৃশ থালা এবং অনড় বৃহদাকার ডেগসমূহ।*[২১] *—হে দাউদের পরিবার! কাজ করো কৃতজ্ঞতার পদ্ধতিতে।*[২২] *আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।*

১৬. এ বিষয়টিও সূরা আম্বিয়ার ৮০ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে এর ব্যাখ্যাও করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল আম্বিয়া, ৭২ টীকা)

১৭. এ বিষয়টিও সূরা আম্বিয়ার ৮১ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে তার ব্যাখ্যাও করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া ৭৪–৭৫ টীকা)

১৮. কোন কোন প্রাচীন তাফসীরকার এর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, ভূগর্ভ থেকে হযরত সুলাইমানের জন্য একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়েছিল। তাতে পানির পরিবর্তে গলিত তামা প্রবাহিত হতো। কিন্তু আয়াতের অন্য ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আমলে তামা গলাবার এবং তার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈরি করার কাজ এত ব্যাপক আকারে চলতো যেন মনে হতো সেখানে তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত রয়েছে। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭৪—৭৫ টীকা)

১৯. যেসব জিনকে হযরত সুলাইমানের অধীন করে দেয়া হয়েছিল তারা গ্রামীণ ও পাহাড় পর্বতে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী ছিল, না সত্যিকার জিন ছিল, যারা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে একটি অদৃশ্য সৃষ্টি হিসেবে পরিচিত—সে ব্যাপারে সূরা আম্বিয়া ও সূরা

নামলের ব্যাখ্যায় আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭৫ এবং আন নাম্‌ল, ২৩, ৪৫ ও ৫২ টীকা)

২০. মূলে تماثيل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এটি تمثال শব্দের বহুবচন। আল্লাহর সৃষ্ট জিনিসের মতো করে তৈরি করা প্রত্যেকটি জিনিসকে আরবীতে বলে। এসব জিনিস মানুষ, পশু, গাছ, ফুল, নদী বা অন্য যে কোন নিষ্প্রাণ জিনিসও হতে পারে।

التمثال اسم للشى المصنوع مشبها بخلق من خلق الله (لسان العرب)

"এমন প্রত্যেকটি কৃত্রিম জিনিসকে তিমসাল বলা হয় যা আল্লাহর তৈরি করা জিনিসের মতো করে তৈরি করা হয়েছে।"

التمثال كل ما صور على صورة غيره من حيوان وغير حيوان –

"এমন প্রত্যেকটি ছবিকে তিমসাল বলা হয়, যা অন্য কোন জিনিসের আকৃতি অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে, তা সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ যাই হোক না কেন।" (তাফসীরে কাশ্‌শাফ)

এ কারণে কুরআন মজীদের এ বর্ণনা থেকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্য যে ছবি তৈরি করা হতো তা মানুষের ও প্রাণীর ছবি অথবা তাদের ভাস্কর মূর্তি হওয়াটা অপরিহার্য ছিল না। হতে পারে হযরত সুলাইমান (আ) নিজের ইমারতগুলো যেসব ফুল, পাতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও কারুকাজে শোভিত করেছিলেন সেগুলোকেই তামাসীল বলা হয়েছে।

হযরত সুলাইমান (আ) ফেরেশতা ও নবীদের ছবি অংকন করিয়েছিলেন, কোন কোন মুফাস্‌সিরের এ ধরনের বক্তব্যই বিভ্রান্তির উদগাতা। বনী ইসরাঈলের পৌরাণিক বর্ণনাবলী থেকে তাঁরা একথা সংগ্রহ করেন এবং তারপর এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, পূর্ববর্তী শরীয়াতগুলোতে এ ধরনের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু কোন প্রকার অনুসন্ধান না করে এ বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করার সময় এ মনীষীবৃন্দ একথা চিন্তা করেননি যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে মূসার শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন সেখানেও শরীয়াতে মুহাম্মাদীর (সা) মতো মানুষের ও প্রাণীর ছবি ও মূর্তি নির্মাণ একই পর্যায়ে হারাম ছিল। আর তাঁরা একথাও ভুলে যান যে, বনী ইসরাঈলের একটি দলের তাঁর সাথে শত্রুতা ছিল এবং এরি বশবর্তী হয়ে তারা শির্‌ক, মূর্তি পূজা ও ব্যভিচারের নিকৃষ্টতম অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করে। তাই তাদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে এ মহিমান্বিত পয়গম্বর সম্পর্কে এমন কোন কথা কোন ক্রমেই মেনে নেয়া উচিত নয় যা আল্লাহ প্রেরিত কোন শরীয়াতের বিরুদ্ধে চলে যায়। একথা সবাই জানেন, হযরত মূসা আলাইহিমুস সালামের পরে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বনী ইসরাঈলে যত নবীই এসেছেন তাঁরা সবাই ছিলেন তাওরাতের অনুসারী। তাঁদের একজনও এমন কোন শরীয়াত আনেননি যা তাওরাতের আইন রদ করে দেয়। এখন তাওরাতের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সেখানে মানুষ ও পশুর ছবি ও মূর্তি নির্মাণকে বারবার একেবারেই হারাম বলে ঘোষণা করা হচ্ছেঃ

"তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না।" (যাত্রা পুস্তক ২০ ঃ ৪)

"তোমরা আপনাদের জন্য অবস্তু প্রতিমা নির্মাণ করিও না, না ক্ষোদিত প্রতিমা কিম্বা স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার কাছে প্রণিপাত করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন ক্ষোদিত প্রস্তর রাখিও না।" (লেবীয় পুস্তক ২৬ ঃ ১)

"পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য কোন আকারের মূর্তিতে ক্ষোদিত প্রতিমা নির্মাণ কর, পাছে পুরুষের বা স্ত্রীর প্রতিকৃতি, পৃথিবীস্থ কোন পশুর প্রতিকৃতি, আকাশে উড্ডীয়মান কোন পক্ষীর প্রতিকৃতি, ভূচর কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি, অথবা ভূমির নীচস্থ জলচর কোন জন্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ কর।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৪ ঃ ১৬—১৮)

"যে ব্যক্তি কোন ক্ষোদিত কিম্বা ছাচে ঢালা প্রতিমা, সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু, শিল্পকরের হস্তনির্মিত বস্তু নির্মাণ করিয়া গোপনে স্থাপন করে, সে শাপগ্রস্ত।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭ ঃ ১৫)

এ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট বিধানের পর কেমন করে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে যে, হযরত সুলাইমান (আ) জিনদের সাহায্যে নবী ও ফেরেশতাদের ছবি বা তাদের প্রতিমা তৈরি করার কাজ করে থাকবেন। আর যেসব ইহুদি হযরত সুলাইমানের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতো যে, তিনি নিজের মুশরিকা স্ত্রীদের প্রেমে বিভোর হয়ে মূর্তি পূজা করতে শুরু করেছিলেন, তাদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে একথা কেমন করে মেনে নেয়া যায়। (দেখুন বাইবেলের রাজাবলী—১, ১১ অধ্যায়)

তবুও মুফাস্সিরগণ বনী ইসরাঈলের এ বর্ণনা উদ্ধৃত করার সাথে সাথে একথাও সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াতে এটি হারাম। তাই এখন হযরত সুলাইমানের (আ) অনুসরণ করে ছবি ও ভাস্কর মূর্তি নির্মাণ করা কারো জন্য বৈধ নয়। কিন্তু বর্তমান যুগের কিছু লোক পাশ্চাত্যবাসীদের অনুকরণে চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণকে হালাল করতে চান। তাঁরা কুরআন মজীদের এ আয়াতকে নিজেদের জন্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। তারা বলেন, একজন নবী যখন এ কাজ করেছেন এবং আল্লাহ নিজেই যখন তাঁর কিতাবে একথা আলোচনা করেছেন এবং এর ওপর তাঁর কোন প্রকার অপছন্দনীয়তার কথা প্রকাশ করেননি তখন অবশ্যই তা হালাল হওয়া উচিত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এসব অন্ধ অনুসারীর এ যুক্তি দু'টি কারণে ভুল। প্রথমত কুরআনে এই যে, "তামাসীল" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ থেকে সুস্পষ্টভাবে মানুষ ও পশুর ছবির অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এ থেকে নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবিও বুঝা যায়। তাই নিছক এ শব্দটির ওপর ভিত্তি করে কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের ও পশুর ছবি হালাল এ বিধান দেয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী সনদযুক্ত মুতাওয়াতির হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণী জাতীয় যে কোন জিনিসের ছবি নির্মাণ ও সংরক্ষণকে অকাট্যভাবে ও চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। এ

প্রসংগে নবী করীম (সা) থেকে যেসব উক্তি প্রমাণিত হয়েছে এবং সাহাবীগণ থেকে যেসব বাণী ও কর্ম উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো আমি এখানে উল্লেখ করছি ঃ

(١) عن عائشة ام المؤمنين ان ام حبيبة وام سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاؤلئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة (بخارى ، كتاب الصلوة - مسلم ، كتاب المساجد، ، نسائى ، كتاب المساجد)

"উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ও হযরত উম্মে সালামাহ (রা) আবিসিনিয়ায় একটি গীর্জা দেখেছিলেন, তাতে ছবি ছিল। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলেন। নবী (সা) বলেন, তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সৎলোকের জন্ম হতো, তার মৃত্যুর পর তার কবরের ওপর তারা একটি উপাসনালয় তৈরি করতো এবং তার মধ্যে এ ছবিগুলো তৈরি করতো। কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবে।"

(٢) عن ابى حجيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المصور -

"আবু হুজাইফা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিত্রকর্মের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন।" (বুখারী ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়, তালাক অধ্যায়, পোশাক অধ্যায়)

(٣) عن ابى زرعة قال دخلت مع ابى هريرة دارا بالمدينة فراى اعلاها مصورا يصور ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقو ذرة -

"আবু যুর'আহ বলেন, একবার আমি হযরত আবু হুরাইরার (রা) সাথে মদীনার একটি গৃহে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, গৃহের ওপর দিকে একজন চিত্রকর চিত্র নির্মাণ করছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন, তার চেয়ে বড় জালেম তার কে হবে যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে! তারা একটি শস্যদানা অথবা একটি পিঁপড়ে বানিয়ে দেখাক তো।" (বুখারী ঃ পোশাক অধ্যায়, মুসনাদে আহমাদ ও মুসলিমের বর্ণনায় পরিষ্কার উল্লেখিত হয়েছে, এটি ছিল মারওয়ানের গৃহ)

(٤) عن ابى محمد الهذلى عن على قال كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى جنازة فقال ايكم ينطلق الى المدينة فلا يدع بها وثنا الا كسره ولا قبرا الا سواه ولا صورة الا لطخها ، فقال رجل انا يا رسول الله فانطلق فهاب اهل المدينة - فرجع - فقال على انا انطلق يا رسول اللّه - قال فانطلق ، فانطلق ثم رجع - فقال يا رسول اللّه لم ادع بها وثنا الا كسرته ولا قبرا الا سويته ولا صورة الا لطختها - ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من عاد لصنعة شى من هذا فقد كفر بما انزل على محمد -

আবু মুহাম্মাদ হাযালী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে মদীনায় গিয়ে সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলবে। সকল কবর ভূমির সমান করে দেবে এবং সকল ছবি নিশ্চিহ্ন করে দেবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এ জন্য প্রস্তুত। কাজেই সে গেলো কিন্তু মদীনাবাসীদের ভয়ে এ কাজ না করেই ফিরে এলো। তখন হযরত আলী (রা) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যাই? নবী করীম (সা) বললেন, ঠিক আছে তুমি যাও। হযরত আলী (রা) গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, আমি কোন মূর্তি না ভেঙ্গে কোন কবর ভূমির সমান না করে এবং কোন ছবি নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়িনি। একথায় নবী করীম (সা) বললেন, এখন যদি কোন ব্যক্তি এ জাতীয় কোন জিনিস তৈরি করে তাহলে সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ঃ জানাযাহ অধ্যায় এবং নাসাঈ, জানাযাহ অধ্যায়েও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে)

(٥) عن ابن عباس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم .... ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ -

"ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, ...আর যে ব্যক্তি ছবি অংকন করলো তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাকে বাধ্য

করা হবে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য। কিন্তু সে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। (বুখারী, তাফসীর অধ্যায়; তিরমিযী, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(٦) عن سعيد ابن ابى الحسن قال كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس انى انسان انما معيشتى من صنعة يدى وانى اصنع هذه التصاوير - فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا - فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه - فقال ويحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شئ ليس فيه روح -

"সাঈদ ইবনে আবুল হাসান বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এলো এবং সে বললো, হে আবু আব্বাস! আমি এমন এক ব্যক্তি যে নিজের হাতে রোজগার করে এবং এ ছবি তৈরি করেই আমি রোজগার করি। ইবনে আব্বাস জবাব দিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা বলতে শুনেছি তোমাকেও তাই বলবো। আমি নবী করীম (সা) থেকে একথা শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন এবং যতক্ষণ সে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার না করবে ততক্ষণ তাকে রেহাই দেবেন না। আর সে কখনো তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। একথা শুনে সে ব্যক্তি বড়ই উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং তার চেহারা হলুদ হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! যদি তোমার ছবি আঁকতেই হয়, তাহলে এই গাছের ছবি আঁকো অথবা এমন কোন জিনিসের ছবি আঁকো যার মধ্যে প্রাণ নেই।" (বুখারী, ব্যবসায় অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(٧) عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে চিত্রকরেরা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে।" (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(৮) عن عبد الله بن عمر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم -

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা এ ছবি আঁকে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা কিছু তোমরা তৈরি করেছো তাকে জীবিত করো।" (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(৯) عن عائشة رضى اللّه عنها انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبى صلى اللّه عليه وسلم بالباب ولم يدخل فقلت اتوب الى الله مما اذ نبت قال ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليها وتوسدها قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة -

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি বালিশ কেনেন। তার গায়ে ছবি আঁকা ছিল। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তিনি দরোজায়ই দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি বললাম, আমি এমন প্রত্যেকটি গোনাহ থেকে তাওবা করছি যা আমি করেছি। নবী করীম (সা) বললেন, এ বালিশটি কেন? বললাম, আপনি এখানে আসবেন এবং এর গায় হেলান দেবেন এ জন্য এটা এখানে রাখা হয়েছে। বললেন, এই ছবি অংকনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা কিছু তোমরা তৈরি করেছো তাকে জীবিত করো। আর ফেরেশ্তারা (রহমতের ফেরেশতারা) এমন কোন গৃহে প্রবেশ করে না যেখানে ছবি থাকে।" (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায়; ইবনে মাজাহ, ব্যবসায় অধ্যায়; মুআত্তা, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়)

(১০) عن عائشة قال دخلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وانا متستره بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول السّتر فهتكه ثم قال ان من اشد الناس عذابا يوم القيمة الذين يشبهون بخلق الله -

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমি একটি পর্দা টাঙিয়ে রেখেছিলাম। তার গায়ে ছবি

আঁকা ছিল। তাঁর চেহারার রং বদলে গেলো। তারপর তিনি পর্দাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, কিয়ামতের দিন যাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দেয়া হবে তাদের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা যারা করে তারাও রয়েছে।" (মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; বুখারী, পোশাক অধ্যায় এবং নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায়)

(١١) عن عائشة قالت قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابى درنوكا فيه الخيل ذوات الا جنحة فامرنى فنزعته -

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে ফিরে এলেন। তখন আমি আমার দরোজায় একটি পর্দা টাঙিয়ে রেখেছিলাম। তার গায়ে পক্ষ বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি আঁকা ছিল। নবী করীম (সা) হুকুম দিলেন, এটি নামিয়ে ফেলো। আমি তা নামিয়ে ফেললাম।" (মুসলিম, পোশাক অধ্যায় এবং নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায়)

(١٢) عن جابر قال نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الصورة فى البيت ونهى ان يصنع ذالك -

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের মধ্যে ছবি রাখতে মানা করেছেন এবং ছবি আঁকতেও নিষেধ করেছেন।" (তিরমিযী, পোশাক অধ্যায়)

(١٣) عن ابن عباس عن ابى طلحة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة -

"ইবনে আব্বাস (রা) আবু তাল্‌হা আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতারা (অর্থাৎ রহমতের ফেরেশতারা) এমন কোন গৃহে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর পালিত থাকে এবং এমন কোন গৃহেও প্রবেশ করে না যেখানে ছবি থাকে।" (বুখারী, পোশাক অধ্যায়)

(١٤) عن عبد اللّه بن عمر قال وعد النبى صلى اللّه عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبى صلى اللّه عليه وسلم فخرج النبى صلى اللّه عليه وسلم فلقيه فشكا اليه ماوجد فقال له انا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب -

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, একবার জিব্রীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসার ওয়াদা করেন কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যায় এবং তিনি আসেন না। নবী করীম (সা) এতে পেরেশান হন। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং তাঁকে পেয়ে যান। তিনি তাঁর কাছে অভিযোগ করেন। তাতে তিনি বলেন, আমরা এমন কোন গৃহে প্রবেশ করি না যেখানে কুকুর বা ছবি থাকে।" (বুখারী, পোশাক অধ্যায়, এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মাদ বিভিন্ন সাহাবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন)

এসব হাদীসের মোকাবিলায় আরো কিছু হাদীস এমন পেশ করা হয় যেগুলোতে ছবির ব্যাপারে ছাড় পাওয়া যায়। যেমন আবু তাল্‌হা আনসারীর এ হাদীস ঃ যে কাপড়ে ছবি উৎকীর্ণ থাকে তা দিয়ে পর্দা তৈরি করে টানিয়ে দেবার অনুমতি আছে। (বুখারী, পোশাক অধ্যায়) হযরত আয়েশার (রা) এ বর্ণনা ঃ ছবিযুক্ত কাপড় ছিঁড়ে যখন তিনি তা দিয়ে তোষক বা গদি বানিয়ে নেন তখন নবী করীম (সা) তা বিছাতে নিষেধ করেননি। (মুসলিম, পোশাক অধ্যায়) সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) এ হাদীস ঃ প্রকাশ্য স্থানে যে ছবি টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে তা নিষিদ্ধ, ছবি সম্বলিত যে কাপড় বিছানায় বিছিয়ে দেয়া হয়েছে তা নিষিদ্ধ নয়। (মুসনাদে আহমাদ) কিন্তু এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীসও ওপরে উদ্ধৃত হাদীসগুলো খণ্ডন করে না। ছবি অংকন করার বৈধতা এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীস থেকেও পাওয়া যায় না। এ হাদীসগুলোতে যদি কোন কাপড়ের গায়ে ছবি অংকিত থাকে এবং তা কিনে নেয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে কেবলমাত্র সে কথাই আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে আবু তাল্‌হা আনসারীর বর্ণিত হাদীসটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি এমন বহু সহীহ হাদীসের পরিপন্থী যেগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবি সম্বলিত কাপড় টানিয়ে দিতে কেবল নিষেধই করেননি বরং তা ছিঁড়ে ফেলেছেন। তাছাড়া তিরমিযী ও মুআত্তায় হযরত আবু তালহার নিজের যে কার্যক্রম উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি ছবি সম্বলিত পর্দা ঝুলানো তো দূরের কথা এমন বিছানা বিছাতেও অপছন্দ করতেন যাতে ছবি আঁকা থাকতো। আর হযরত আয়েশা ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলা যায়, তা থেকে কেবলমাত্র এতটুকু বৈধতাই প্রকাশ পায় যে, ছবি যদি মর্যাদাপূর্ণ স্থানে না থাকে বরং হীনভাবে বিছানায় রাখা থাকে এবং তাকে পদদলিত করা হয়, তাহলে তা সহনীয়। যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ শিল্পকে মানব সভ্যতার সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব গণ্য করে এবং তা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত করতে চায় সার্বিকভাবে তার বৈধতা এ হাদীসগুলো থেকে কেমন করে প্রমাণ করা যেতে পারে?

ছবির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চূড়ান্তভাবে উম্মাতের জন্য যে বিধান রেখে গেছেন তার সন্ধান বর্ষীয়ান ও শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের অনুসৃত কর্মনীতি থেকেই পাওয়া যায়। ইসলামে এটি একটি স্বীকৃত মূলনীতি যে, সমস্ত পর্যায়ক্রমিক বিধান ও প্রাথমিক উদারনীতির পর সর্বশেষে নবী করীম (সা) যে বিধান নির্ধারণ করেন সেটাই নির্ভরযোগ্য ইসলামী বিধান। আর নবী করীমের (সা) পর শ্রেষ্ঠ ও বর্ষীয়ান সাহাবীগণ কর্তৃক কোন পদ্ধতিকে কার্যকর করা একথারই প্রমাণ পেশ করে যে, নবী করীম (সা)

উম্মাতকে ঐ পদ্ধতির ওপরই রেখে গিয়েছিলেন। এবার দেখুন ছবির ব্যাপারে এই পবিত্র দলটির আচরণ কিরূপ ছিল ঃ

قال عمر رضى اللّه عنه انا لا ندخل كنا ئسكم من اجل التماثيل التى فيها الصور (بخارى ، كتاب الصلوة)

"হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খৃষ্টানদের বলেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় প্রবেশ করবো না, কারণ তার মধ্যে ছবি রয়েছে।" (বুখারী, সালাত অধ্যায়)

كان ابن عباس يصلى فى بيعة الابيعة فيها تماثيل –

"ইবনে আব্বাস (রা) গীর্জায় নামায পড়ে নিতেন কিন্তু এমন কোন গীর্জায় পড়তেন না যার মধ্যে ছবি থাকতো।" (বুখারী, সালাত অধ্যায়)

عن ابى الهياج الاسدى ، قال لى على الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ولا صورة الا طمستها –

"আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, হযরত আলী (রা) আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন আমি কি তোমাকে সেখানে পাঠাবো না? আর তা হচ্ছে এই যে, তুমি কোন মূর্তি না ভেঙে ছাড়বে না, কোন উচুঁ কবর মাটির সমান না করে ছেড়ে দেবে না এবং কোন ছবি নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না।" (মুসলিম, জানাযাহ অধ্যায় এবং নাসাঈ, জানাযাহ অধ্যায়)

عن حنش الكنانى عن على انه بعث عامل شرطته فقال له اتدرى على ما ابعثك ؟ على ما بعثنى عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان انحت كل صورة وان اسوى كل قبر–

"হান্শুল কিনানী বলেন, হযরত আলী (রা) তাঁর পুলিশ বিভাগের কোতায়ালকে বলেন, তুমি জানো আমি তোমাকে কোন্ অভিযানে পাঠাচ্ছি? এমন অভিযানে যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকটি ছবি নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং প্রত্যেকটি কবরকে জমির সাথে মিশিয়ে দাও।" (মুসনাদে আহমাদ)

এই প্রমাণিত ইসলামী বিধানকে ইসলামী ফকীহগণ মেনে নিয়েছেন এবং তাঁরা একে ইসলামী আইনের একটি ধারা গণ্য করেছেন। কাজেই আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী 'তাওযীহ'–এর বরাত দিয়ে লিখছেন ঃ

"আমাদের সহযোগীগণ (অর্থাৎ হানাফী ফকীহগণ) এবং অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, কোন জীবের ছবি আঁকা কেবল হারামই নয় বরং মারাত্মক পর্যায়ের হারাম এবং কবীরাহ গোনাহের অন্তরভুক্ত। অংকনকারী হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা তৈরি করলেও সর্বাবস্থায় তা হারাম। কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। অনুরূপভাবে ছবি কাপড়ে, বিছানায়, দীনারে বা দিরহামে অথবা পয়সায় কিংবা কোন পাত্রে বা দেয়ালে যেখানেই অংকন করা হোক না কেন তা হারাম। তবে জীব ছাড়া অন্য কোন জিনিস যেমন গাছপালা ইত্যাদির ছবি অংকন করা হারাম নয়। এ সমস্ত ব্যাপারে ছবির ছায়াধারী হবার বা না হবার মধ্যে কোন ফারাক নেই। এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন ইমাম মালেক (র), ইমাম সুফিয়ান সওরী (র), ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অন্যান্য উলামা। কাযী ঈয়ায বলেন, মেয়েদের খেলনা পুতুল এর আওতা বহির্ভূত। কিন্তু ইমাম মালেক (র) এগুলো কেনাও অপছন্দ করতেন।" (উমদাতুল কারী, ২২ খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, এ অভিমতকেই ইমাম নববী মুসলিমের ব্যাখায় আরো বেশী বিস্তারিত আকারে উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন শারহে নববী, মিসরে মুদ্রিত, ১৪ খণ্ড, ৮১–৮২ পৃষ্ঠা)

এতো গেলো ছবি আঁকা সম্পর্কিত বিধান। এখন থাকে অন্যের আঁকা চবি ব্যবহার করার বিষয়। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার অসকালানী মুসলিম ফকীহগণের অভিমত এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"মালেকী ফকীহ ইবনে আরাবী বলেন, যে ছবির ছায়া পড়ে তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে তো 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে—চাই তা অসম্মানজনকভাবে রাখা হোক বা না হোক। একমাত্র মেয়েদের খেলার পুতুল এ ইজমার বাইরে থাকে।........ইবনে আরাবী একথাও বলেন, যে ছবির ছায়া হয় না তা যদি তার নিজের অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে (অর্থাৎ আয়নার প্রতিচ্ছায়ার মতো না হয় বরং ছাপানো ছবির মতো স্থায়ী ও অনড় হয়) তাহলে তাও হারাম—তাকে হীনতার সাথে রাখা হোক বা না হোক। তবে হাঁ, যদি তার মাথা কেটে দেয়া হয় অথবা তার অংশগুলো আলাদা করে দেয়া হয়, তাহলে তার ব্যবহার বৈধ। ....ইমামুল হারামাইন একটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, পর্দা বা বালিশের ওপর যদি কোন ছবি আঁকা থাকে, তাহলে তা ব্যবহারের অনুমতি আছে কিন্তু দেয়াল বা ছাদের গায়ে লাগানো ছবি অবৈধ। কারণ এ অবস্থায় ছবি মর্যাদা লাভ করে। পক্ষান্তরে পর্দা ও বালিশে ছবি অসম্মানজনক অবস্থায় থাকবে।...........ইবনে আবী শাইবা ইকরামা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাবে'ঈদের যুগের আলেমগণ এ অভিমত পোষণ করতেন যে, বিছানায় ও বালিশে ছবি থাকলে তা তাঁর জন্য লাঞ্ছনাকর হয়। তাছাড়া তাদের এ চিন্তাও ছিল যে, উঁচু জায়গায় যে ছবিই লাগানো হয় তা হারাম এবং পদতলে যাকে পিষ্ট করা হয় তা জায়েয। এ অভিমত ইবনে সীরীন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, ইকরামা ইবনে খালেদ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।" (ফাত্হুল বারী, ১০ খণ্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে একথা ভালোভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামে ছবি হারাম হওয়ার ব্যাপারটি কোন মতদ্বৈততামূলক বা সন্দেহযুক্ত বিষয় নয়। বরং নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট উক্তি, সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা এবং মুসলিম ফকীহগণের সর্বসম্মত ফতোয়ার ভিত্তিতে এটি একটি স্বীকৃত আইন। বিদেশী ও বিজাতীয় সভ্যতা–সংস্কৃতি প্রভাবিত কিছু লোকের চুলচেরা অপব্যাখ্যা তাতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

এ প্রসংগে আরো কয়েকটি কথাও অনুধাবন করতে হবে। এর ফলে আর কোন প্রকার বিভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না।

কেউ কেউ ফটো ও হাতে আঁকা ছবির মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেন। অথচ শরীয়াত ছবিকেই হারাম করেছে, ছবির কোন বিশেষ পদ্ধতিকে হারাম করেনি। ফটো ও হাতে আঁকা ছবির মধ্যে ছবি হবার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে যা কিছু পার্থক্য তা কেবলমাত্র ছবি নির্মাণ পদ্ধতির দিক দিয়েই আছে এবং এদিক দিয়ে শরীয়াত স্বীয় বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি।

কেউ কেউ যুক্তি দিয়ে থাকেন, ইসলামে ছবি হারাম করা হয়েছিল শুধুমাত্র শির্ক ও মূর্তিপূজা রোধ করার জন্য। আর এখন তার কোন ভয় নেই। কাজেই এখন এ নির্দেশ কার্যকর না থাকা উচিত। কিন্তু এ যুক্তি সঠিক নয়। প্রথমত হাদীসে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, কেবলমাত্র শির্ক মূর্তিপূজার বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য ছবিকে হারাম করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ দাবীও একেবারেই ভিত্তিহীন যে, বর্তমানে দুনিয়ায় শির্ক ও মূর্তিপূজার অবসান ঘটেছে। আজ এই উপমহাদেশেই কোটি কোটি মুশরিক ও মূর্তিপূজারী রয়ে গেছে। দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে শির্ক হচ্ছে। খৃষ্টানদের মতো কিতাবধারীগণও আজ হযরত ঈসা (আ), হযরত মার্‌য়াম (আ) ও তাদের বহু মনীষীর মূর্তি ও ছবির পূজা করছে। এমনকি মুসলমানদের একটি বড় অংশও সৃষ্টিপূজার বিপদ থেকে রেহাই পেতে পারেনি।

কেউ কেউ বলেন, কেবলমাত্র মুশরিকী ধরনের ছবিগুলোই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অর্থাৎ এমনসব ব্যক্তির ছবি ও মূর্তি যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে নেয়া হয়েছে। বাদবাকি অন্যান্য ছবি ও মূর্তি হারাম হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু এ ধরনের কথা যারা বলেন তারা আসলে শরীয়াত প্রণেতার উক্তি ও বিধান থেকে আইন আহরণ করার পরিবর্তে নিজেরাই নিজেদের শরীয়াত প্রণেতা হয়ে বসেছেন। তারা জানেন না, ছবি কেবলমাত্র শির্ক ও মূর্তিপূজার কারণ হয় না বরং দুনিয়ায় আরো অনেক ফিত্‌নারও কারণ হয়েছে এবং হয়ে চলছে। যেসব বড় বড় উপকরণের মাধ্যম রাজা বাদশাহ, স্বৈরাচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব সাধারণ মানুষের মগজে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে ছবি তার অন্যতম। দুনিয়ায় অশ্লীলতা ও যৌনতার বিস্তারের জন্যেও ছবিকে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আজকের যুগে এ ফিত্‌নাটি অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসরমান। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন, বিপর্যয় ও দাংগা–হাংগামা সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য ছবিকে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয় এবং আজকের যুগে এর প্রচলন হয়েছে সবচেয়ে বেশী। তাই শরীয়াত প্রণেতা কেবলমাত্র মূর্তিপূজা প্রতিরোধের জন্য ছবি হারাম হবার হুকুম দিয়েছেন, একথা মনে করা আসলেই ভুল। শরীয়াত প্রণেতা শর্তহীনভাবে জীবের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ করেছেন। আমরা নিজেরা যদি শরীয়াত প্রণেতা নই বরং শরীয়াত

প্রণেতার অনুসারী হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের শর্তহীনভাবে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে হুকুমের কোন কার্যকারণ বের করে সে দৃষ্টিতে কিছু ছবি হারাম এবং কিছু ছবি হালাল গণ্য করতে থাকবো, এটা আমাদের জন্য কোনক্রমেই বৈধ নয়।

কিছু লোক আপাত দৃষ্টিতে একেবারেই 'অক্ষতিকর ধরনের কতিপয় ছবির দিকে ইংগিত করে বলেন, এগুলোতে ক্ষতি কি? এগুলোতো শিরক, অশ্লীলতা বিপর্যয় সৃষ্টি, রাজনৈতিক প্রচারণা এবং এমনি ধরনের অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত। এ ক্ষেত্রে এগুলোর নিষিদ্ধ হবার কারণ কি হতে পারে? এ ব্যাপারে লোকেরা আবার সেই একই ভুল করে অর্থাৎ প্রথমে হুকুমের কার্যকারণ নিজেরা বের করে এবং তারপর প্রশ্ন করতে থাকে, যখন অমুক জিনিসের মধ্যে এ কার্যকারণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন তা নাজায়েয হবে কেন? এ ছাড়াও তারা ইসলামী শরীয়াতের এ নিয়মটিও বোঝে না যে, শরীয়াতে হালাল ও হারামের মধ্যে এমন কোন অস্পষ্ট সীমারেখা কায়েম করে না যা থেকে মানুষ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না যে সে বৈধতার সীমার মধ্যে কতদূরে অবস্থান করছে এবং কোথায় এ সীমা অতিক্রম করে গেছে। বরং শরীয়াত এমন পার্থক্য রেখা টেনে দেয় যাকে প্রত্যেক ব্যক্তি উন্মুক্ত দিবালোকের মতো প্রত্যক্ষ করতে পারে। জীবের ছবি হারাম এবং অজীবের ছবি হালাল— ছবির ব্যাপারে এ পার্থক্য রেখা পুরোপুরি সুস্পষ্ট। এ পার্থক্য রেখার মধ্যে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই। যে ব্যক্তি শরীয়াতের বিধান মেনে চলতে চায় তার জন্য কোন্ জিনিসটি হারাম এবং কোন্ জিনিসটি হালাল তা সে পরিষ্কারভাবে জানতে পারে। কিন্তু জীবের ছবির মধ্যে যদি কোনটিকে জায়েয ও কোনটিকে নাজায়েয গণ্য করা হয় তাহলে উভয় ধরনের ছবির বৃহত্তর তালিকা দিয়ে দেবার পরও বৈধতা ও অবৈধতার সীমারেখা কোনদিনও সুস্পষ্ট হতে পারে না এবং অসংখ্য ছবি এমন থেকে যাবে যেগুলোকে বৈধতার সীমারেখার মধ্যে না বাইরে মনে করা হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যাবে। এ ব্যাপারটি ঠিক তেমনি যেমন মদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম হচ্ছে এ থেকে একেবারেই দূরে অবস্থান করতে হবে। এটি এ ব্যাপারে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু যদি বলা হয়, এর এমন একটি পরিমাণ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকা উচিত যার ফলে নেশার সৃষ্টি হয়, তাহলে হালাল ও হারামের মধ্যে কোন জায়গায়ও পার্থক্য রেখা প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারবে না এবং কি পরিমাণ মদ পান করা যাবে এবং কোথায় গিয়ে থেমে যেতে হবে, এ ফায়সালা কোন ব্যক্তিই করতে পারবে না। (আরো বেশী বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ খণ্ড, ১৫২–১৫৫ পৃষ্ঠা।

২১. এ থেকে জানা যায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজগৃহে বিরাট আকারে মেহমানদের আপ্যায়ন করা হতো। বড় বড় হাওযের সমান গামলা তৈরি করা হয়েছিল। তার মধ্যে লোকদের জন্য খাবার উঠিয়ে রাখা হতো। বৃহদাকার ডেগ বানিয়ে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে এক সংগে হাজার হাজার মানুষের খাদ্য পাকানো হতো।

২২. অর্থাৎ কৃতজ্ঞ বান্দাদের মতো কাজ করো। যে ব্যক্তি মুখেই কেবল অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করে কিন্তু তার অনুগ্রহকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তার নিছক মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থহীন। আসল কৃতজ্ঞ বান্দা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে তার

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٤﴾

তারপর যখন সুলাইমানের ওপর আমি মৃত্যুর ফায়সালা প্রয়োগ করলাম তখন জিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর দেবার মতো সেই ঘুণ ছাড়া আর কোন জিনিস ছিল না যা তার লাঠিকে খেয়ে চলছিল। এভাবে যখন সুলাইমান পড়ে গেলো, জিনদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো[২৩] যে, যদি তারা অদৃশ্যের কথা জানতো তাহলে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।[২৪]

মুখেও অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয় এবং এ সংগে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে তার ইচ্ছামতো কাজেও ব্যবহার করে।

২৩. মূল শব্দ হচ্ছে, تبينت الجن —এ বাক্যাংশের একটি অনুবাদ আমি ওপরে করেছি। এর আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে ঃ জিনদের অবস্থা পরিষ্কার হয়ে গেলো অথবা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। প্রথম অবস্থায় এর অর্থ হবে, খোদ জিনেরাই জানতে পারবে যে, অদৃশ্য বিষয় জানার ব্যাপারে তাদের ধারণা ভুল। দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে, সাধারণ মানুষেরা যারা জিনদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী মনে করতো তাদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জিনেরা কোন অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।

২৪. বর্তমান যুগের কোন কোন মুফাস্সির এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ হযরত সুলাইমানের (আ) ছেলে রাহব্‌'আম যেহেতু ছিলেন অযোগ্য, বিলাশী ও তোষামোদকারী মোসাহেব পরিবৃত, তাই নিজের মহিমান্বিত পিতার ইন্তেকালের পর তার ওপর যে মহান দায়িত্ব এসে পড়েছিল তা পালন করতে তিনি সক্ষম হননি। তার ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পরেই রাষ্ট্রব্যবস্থা পতনমুখী হয় এবং আশপাশের সীমান্ত এলাকার যেসব উপজাতিকে (অর্থাৎ জিন) হযরত সুলাইমান (আ) তাঁর প্রবল পরাক্রমের মাধ্যমে নিজের দাসে পরিণত করে রেখেছিলেন তারা সবাই নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা কোনক্রমেই কুরআনের শব্দাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুরআনের শব্দাবলী আমাদের সামনে যে নকশা পেশ করছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত সুলাইমান এমন সময় মৃত্যুবরণ করেন যখন তিনি একটি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে ছিলেন। এ লাঠির কারণে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তিনি জীবিত আছেন মনে করেই জিনেরা তাঁর কাজ করে চলছিল। শেষে যখন লাঠিতে ঘূন ধরে গেলো এবং তা ভেতর থেকে অন্তসারশূন্য হয়ে গেলো তখন তাঁর মরদেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়লো এবং জিনেরা জানতে পারলো তিনি মারা গেছেন। এই পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ঘটনা বর্ণনার গায়ে এ ধরনের অর্থের প্রলেপ লাগাবার কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে যে, ঘূন অর্থ হচ্ছে হযরত সুলাইমানের

ছেলের অযোগ্যতা, লাঠি অর্থ হচ্ছে তাঁর কর্তৃত্ব ক্ষমতা এবং তাঁর মৃতদেহ পড়ে যাবার মানে হচ্ছে তাঁর রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া? এ বিষয়টি বর্ণনা করাই যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে কি এ জন্য সাবলীল আরবী ভাষায় শব্দের আকাল হয়ে গিয়েছিল? এভাবে হেরফের করে তা বর্ণনা করার কি কোন প্রয়োজন ছিল? এ ধরনের হেঁয়ালি ও ধাঁধার ভাষা কুরআনের কোথায় ব্যবহবার করা হয়েছে? আর এ বাণী প্রথমে সে যুগের সাধারণ আরবদের সামনে যখন নাযিল হয় তখন তারা কিভাবে এ ধাঁধার মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

তারপর এ ব্যাখ্যার সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত বিষয়টি হচ্ছে এই যে, এখানে জিন বলতে বুঝানো হয়েছে সীমান্ত উপজাতিগুলোকে, যাদেরকে হযরত সুলাইমান নিজের সেবাকর্মে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ উপজাতিগুলোর মধ্যে কে অদৃশ্যজ্ঞানের দাবীদার ছিল এবং মুশরিকরা কাকে অদৃশ্য জ্ঞানী মনে করতো? আয়াতের শেষের শব্দগুলো একটু মনোযোগ সহকারে পড়লে যে কোন ব্যক্তি নিজেই দেখতে পারে, জিন বলতে এখানে অবশ্যই এমন কোন দল বুঝানো হয়েছে যারা নিজেরাই অদৃশ্যজ্ঞানের দাবীদার ছিল অথবা লোকেরা তাদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী মনে করতো এবং তাদের অদৃশ্য বিষয়ক অজ্ঞতার রহস্য এ ঘটনাটিই উদঘাটন করে দিয়েছে যে, তারা হযরত সুলাইমানকে জীবিত মনে করেই তাঁর খেদমতে নিযুক্ত থাকে অথচ তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। কুরআনের এই সুস্পষ্ট বর্ণনা দেখার পর জিন বলতে সীমান্ত উপজাতিদেরকে বুঝানো হয়েছে এই মতটি পুনরবিবেচনা করা একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বস্তুবাদী দুনিয়ার সামনে জিন নামের একটি অদৃশ্য সৃষ্টির অস্তিত্ব মেনে নিতে যারা লজ্জা অনুভব করছিলেন তারা কুরআনের এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পর নিজেদের জটিল মনগড়া ব্যাখ্যার ওপরই জোর দিতে থাকেন।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বলেছেন, আরবের মুশরিকরা জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তাদেরকে আল্লাহর সন্তান মনে করতো এবং তাদের কাছে আশ্রয় চাইতো ঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ

"আর তারা জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছে অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।" (আল আন'আম, ১০০)

وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا

"আর তারা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছে"
(আস্ সাফ্‌ফাত, ১৫৮)

وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ

"আর ব্যাপার হচ্ছে, মানব জাতির মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোকের কাছে আশ্রয় চাইতো।" (আল জিন, ৬)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۚ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۚ وَهَلْ نُجٰزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

সাবার[২৫] জন্য তাদের নিজেদের আবাসেই ছিল একটি নিদর্শন।[২৬] দু'টি বাগান ডাইনে ও বামে।[২৭] খাও তোমাদের রবের দেয়া রিযিক থেকে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উত্তম ও পরিচ্ছন্ন দেশ এবং ক্ষমাশীল রব। কিন্তু তারা মুখ ফিরালো।[২৮] শেষ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা[২৯] এবং তাদের আগের দু'টি বাগানের জায়গায় অন্য দু'টি বাগান তাদেরকে দিয়ে দিলাম যেখানে ছিল তিক্ত ও বিস্বাদ ফল এবং ঝাউগাছ ও সামান্য কিছু কুল।[৩০] এ ছিল তাদের কুফরীর প্রতিদান যা আমি তাদেরকে দিয়েছি এবং অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে আমি এহেন প্রতিদান দেই না।

তাদের এসব বিশ্বাসের মধ্যে একটি বিশ্বাস এও ছিল যে, তারা জিনদেরকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন মনে করতো এবং অদৃশ্য বিষয় জানার জন্য জিনদের শরণাপন্ন হতো। এ বিশ্বাসটির অসারতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ এখানে এ ঘটনাটি শুনাচ্ছেন এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবের কাফেরদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, তোমরা অনর্থক জাহেলিয়াতের মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর জোর দিয়ে চলছো অথচ তোমাদের এ বিশ্বাসগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন। (আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সামনের দিকে ৬৩ টীকা দেখুন)

২৫. এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা বুঝতে হলে প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু সামনে রাখতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ আরবের কাফেররা আখেরাতের অগমনকে বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী মনে করতো এবং যে রসূল এ আকীদা পেশ করতেন তাঁর ব্যাপারে প্রকাশ্যে বলতো যে এ ধরনের অদ্ভূত কথা যে ব্যক্তি বলে সে পাগল হতে পারে অথবা জেনে বুঝে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ প্রথমে কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি পেশ করেন। ৭, ৮ ও ১২ টীকায় আমি এগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছি। এরপর দ্বিতীয় রুকূ'তে হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমানের এবং তারপর সাবার কাহিনীকে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠে মানব জাতির নিজের জীবন বৃত্তান্তই কর্মফল বিধানের সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে — একথাটি অনুধাবন করানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। নিজের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলে মানুষ নিজেই একথা জানতে পারে যে, এ দুনিয়া এমন

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا
فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا اٰمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بٰعِدْ
بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ
كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

আর আমি তাদের ও তাদের যে জনবসতিগুলোতে সমৃদ্ধি দান করেছিলাম, সেগুলোর অন্তরবর্তী স্থানে দৃশ্যমান জনপদ গঠন করেছিলাম এবং একটি আন্দাজ অনুযায়ী তাদের মধ্যকার ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করেছিলাম।[৩১] পরিভ্রমণ করো এসব পথে রাত্রিদিন পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে। কিন্তু তারা বললো, "হে আমাদের রব! আমাদের ভ্রমণের দূরত্ব দীর্ঘায়িত করো।"[৩২] তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে কাহিনী বানিয়ে রেখে দিয়েছি এবং তাদেরকে একদম ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি।[৩৩] নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বেশী বেশী সবরকারী ও বেশী বেশী কৃতজ্ঞ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য।[৩৪]

কোন নৈরাজ্যময় জগত নয় যার সমগ্র কারখানাটি নিজের ইচ্ছামতো খামখেয়ালীভাবে চলে। বরং এমন এক আল্লাহ এখানে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করছেন যিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন। তিনি কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বনকারীদের সাথে এক ধরনের ব্যবহার করেন এবং অকৃতজ্ঞ ও নিয়ামত অস্বীকারকারীদের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করেন। যে আল্লাহর রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ ধরনের নিয়মের অধীন। তাঁর রাজ্যে পুণ্য ও পাপের পরিণাম কখনো এক হতে পারে না। যদি কেউ শিক্ষা নিতে চায় তাহলে এ ইতিহাস থেকেই এ শিক্ষা নিতে পারে। তাঁর ইনসাফ ও ন্যায় নীতির অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, এমন একটি সময় আসতেই হবে যখন সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান এবং অসৎকাজের পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে।

২৬. অর্থাৎ এ বিষয়ের নিদর্শন যে, যা কিছু তারা লাভ করেছে তা কারো দান, তাদের নিজেদের উদ্ভাবন নয়। আর এ বিষয়েরও নিদর্শন যে, তাদের বন্দেগী ও ইবাদাত এবং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার অধিকারী হচ্ছেন এমন এক আল্লাহ যিনি তাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন। ঐ নিয়ামত দানের ব্যাপারে যাদের কোন অংশ নেই তারা ইবাদাত ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী নয়। আবার এ বিষয়েরও নিদর্শন যে, তাদের সম্পদ অবিনশ্বর নয় বরং যেভাবে তা এসেছে ঠিক তেমনিভাবে চলে যেতেও পারে।

২৭. এর অর্থ এ নয় যে, সাবা দেশে মাত্র দু'টিই বাগান ছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সমগ্র সাবা রাজ্য শ্যামল সবুজ ক্ষেত ও বনানীতে পরিপূর্ণ ছিল। তার যে কোন জায়গায় দাঁড়ালে দেখা যেতো ডাইনেও বাগান এবং বাঁয়েও বাগান।

২৮. অর্থাৎ বন্দেগী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে তারা নাফরমানি ও নিমকহারামির পথ অবলম্বন করে।

২৯. মূলে বলা হয়েছে سَيْلَ الْعَرِمِ দক্ষিণ আরবের ভাষায় 'আরিম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'আরিমন' (عـرمـن) থেকে। এর অর্থ হচ্ছে "বাঁধ"। ইয়ামনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সম্প্রতি যেসব প্রাচীন শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলোতে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৫৪২ বা ৫৪৩ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি সম্পর্কে বলা যায়। ইয়ামনের হাবশী গভর্ণর আবৃরাহা "সাদ্দি মারিব" এর সংস্কার কাজ শেষ করার পর এটি স্থাপন করেন। এতে তিনি বারবার এ শব্দটি বাঁধ অর্থে ব্যবহার করেন। কাজেই "সাইলুল আরিম" মানে হচ্ছে বাঁধ ভেঙ্গে যে বন্যা আসে।

৩০. অর্থাৎ 'সাইলুল আরিম' আসার ফলে সাবা এলাকা ধ্বংস হয়ে যায়। সাবার অধিবাসীরা পাহাড়ের মধ্যে বাঁধ বেঁধে যেসব খাল ও পানি প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল তা সব নষ্ট হয়ে যায় এবং পানি সেচের সমগ্র ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়। এরপর যে এলাকা এক সময় জান্নাত সদৃশ ছিল তা আগাছা ও জংগলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং সেখানে নিছক বন্য কুল ছাড়া আর আহারযোগ্য কিছু থাকেনি।

৩১. "সমৃদ্ধ জনপদ" বলতে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদে সাধারণভাবে এ গুণবাচক শব্দ দিয়ে এর উল্লেখ করা হয়েছে। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন আল আ'রাফ, ১৩৭ আয়াত; বনী ইসরাঈল, ১ আয়াত এবং আল আম্বিয়া, ৭১ ও ৮১ আয়াত)

"দৃশ্যমান জনপদ" হচ্ছে এমন সব জনবসতি যেগুলো সাধারণ রাজপথের পাশে অবস্থিত। কোন এক কোণায় আড়ালে অবস্থিত নয়। আবার এর এ অর্থও হতে পারে যে, এ জনবসতিগুলো বেশী দূরে দূরে অবস্থিত ছিল না বরং লাগোয়া ছিল। একটি জনপদের চিহ্ন শেষ হবার পর দ্বিতীয় জনপদ শুরু হয়ে যেতো।

একটি আন্দাজ অনুযায়ী ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করার মানে হচ্ছে, ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত পুরা সফর অবিচ্ছিন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতো, এর এক মঞ্জিল থেকে আর এক মঞ্জিলের দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা ছিল। জনবসতিপূর্ণ এলাকা সফর ও অনাবাদ মরু এলাকা সফরের মধ্যে এ পার্থক্য থাকে। মরুভূমির মধ্যে মুসাফির যতক্ষণ চায় চলে এবং যতক্ষণ চলে কোথাও এক জায়গায় ডেরা বাঁধে। পক্ষান্তরে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পথের এক জনপদ থেকে আর এক জনপদ পর্যন্ত এলাকার মধ্যকার দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা থাকে। পথিক পথে কোন্ কোন্ জায়গায় থামবে, দুপুরে কোথায় বিশ্রাম নেবে এবং কোথায় রাত কাটাবে এর পূর্ণ কর্মসূচী পূর্বাহ্নেই তৈরি করে নিতে পারে।

৩২. তারা যে মুখে এ দোয়া উচ্চারণ করেছিল, এমনটি অপরিহার্য নয়। আসলে যে ব্যক্তিই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় সে যেন তার অবস্থা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একথা বলে, হে আল্লাহ! আমি এ নিয়ামতগুলোর যোগ্য নই। অনুরূপভাবে যে জাতি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে অযথা সুবিধা লাভ করে সে যেন নিজের রবের কাছে দোয়া করে, হে আমাদের রব। এ অনুগ্রহগুলো আমাদের থেকে ছিনিয়ে নাও, কারণ আমরা এর যোগ্য নই।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সঠিক পেয়েছে এবং একটি ক্ষুদ্র মু'মিন দল ছাড়া বাকি সবাই তারই অনুসরণ করেছে।[৩৫] *তাদের ওপর ইবলিসের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু যা কিছু হয়েছে তা এ জন্য হয়েছে যে, আমি দেখতে চাচ্ছিলাম কে পরকাল মান্যকারী এবং কে সে ব্যাপারে সন্দিহান।*[৩৬] *তোমার রব সব জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক।*[৩৭]

এ ছাড়াও رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا (হে আল্লাহ! আমাদের সফর দীর্ঘায়িত করে দাও)—এ শব্দগুলো থেকে কিছুটা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত সাবা জাতির চোখে তাদের বিপুল জনসংখ্যা বিরক্তিকর মনে হয়েছিল এবং অন্যান্য জাতির মতো তারাও নিজেদের বর্ধিত জনসংখ্যাকে সংকট মনে করে জন্ম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়েছিল।

৩৩. অর্থাৎ সাবা জাতি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যে তাদের বিক্ষিপ্ততা ও বিশৃংখলা প্রবাদে পরিণত হয়। আজো যদি আরববাসী কোন জাতির মধ্যকার বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের কথা আলোচনা করে তাহলে বলে تفرقوا ايدى سبا "তারা তো এমন নৈরাজ্যের শিকার হয়েছে যেমন সাবা জাতি নৈরাজ্যের শিকার হয়েছিল।" আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন অনুগ্রহের অবসান ও অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয় তখন সাবার বিভিন্ন গোত্র নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করে আরবের বিভিন্ন এলাকায় চলে যায়। গাস্সানীরা জর্দান ও সিরিয়ার দিকে চলে যায়। আওস ও খায্রাজ গোত্র ইয়াস্রিবে বসতি স্থাপন করে। খুযা'আহ গোত্র জেদ্দার নিকটবর্তী তিহামা এলাকায় আবাস গড়ে তোলে। আয্দ গোত্র ওমানে গিয়ে ঠাঁই নেয়। লাখ্ম, জযাম এবং কিন্দাও বেরিয়ে পড়তে বাধ্য নয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত সাবা নামে কোন জাতিই আর দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকেনি। কেবলমাত্র গল্প কাহিনীতেই তার আলোচনা থেকে গেছে।

৩৪. এ প্রেক্ষাপটে সবরকারী ও কৃতজ্ঞ বলতে এমন ব্যক্তি বা দল বুঝায় যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত লাভ করে অহংকারে মেতে ওঠে না, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আত্মম্ভরী হয় না এবং যে আল্লাহ এসব কিছু দান করেছেন তাঁকে ভুলে যায় না। এ ধরনের লোকেরা যারা উন্নতি ও অগ্রগতির সুযোগ পেয়ে নাফরমানির পথ অবলম্বন করে এবং অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হয় তাদের অবস্থা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিতে পারে।

৩৫. ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকে সাবা জাতির মধ্যে এমন একটি দল ছিল যারা অন্য উপাস্যদেরকে মেনে চলার পরিবর্তে এক আল্লাহকে মেনে চলতো।

বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে ইয়ামনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে যেসব শিলালিপি উদ্ধার করা হয় তার, মধ্য থেকে কোন কোনটি এই স্বল্প সংখ্যক দলের অস্তিত্ব চিহ্নিত করে। খৃঃ পূঃ ৬৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের কোন কোন শিলালিপি একথা বলে যে, সাবা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু ইবাদাত গৃহ স্থাপিত ছিল যেগুলো আসমানি বা আসমান ওয়ালার (অর্থাৎ আসমানের রব) ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কোন কোন স্থানে এ উপাস্যের নাম ملكن نوسموى (আকাশসমূহের মালিক বাদশাহ) লেখা হয়েছে। এ দলের লোকেরা একনাগাড়ে শত শত বছর ইয়ামনে বাস করতে থাকে। কাজেই ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে একটি শিলালিপিতে اله نوسموى (আকাশসমূহের ইলাহ) নামে একটি ইবাদাত গৃহ নির্মাণের উল্লেখ দেখা যায়। তারপর ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এ শব্দগুলো পাওয়া যায় ঃ بنصر وردا الهن بعل سمعين وارضين (অর্থাৎ এমন খোদার মদদ ও সাহায্য সহকারে যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিক)। একই সময়ের ৪৫৮ খৃষ্টাব্দের আর একটি শিলালিপিতে একই খোদার জন্য "রহমান" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মূল শব্দ হচ্ছে بردا رحمنن (অর্থাৎ রহমানের সাহায্যে)।

৩৬. অর্থাৎ এ ক্ষমতা ইবলিসের ছিল না যে তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে চাচ্ছিল কিন্তু ইবলিস জোর করে তাদেরকে নাফরমানির পথে টেনে নিয়ে গেছে। আল্লাহ তাকে যে শক্তি দিয়েছিলেন তা কেবল এতটুকুই ছিল যে, সে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে এবং যারা তার পিছনে চলতে চায় তাদেরকে নিজের অনুসারী করতে পারে। যারা পরকাল মানে এবং যারা পরকালের অগমনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তাদের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য ইবলিসকে এ বিপথগামী করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

অন্য কথায় আল্লাহর এ বাণী এ সত্যটিই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন জিনিসই এমন নেই যা এ দুনিয়ায় মানুষকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার গ্যারান্টি দিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি একথা না মানে যে, মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবিত হতে হবে এবং আল্লাহর সামনে নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাহলে সে অবশ্যই পথ ভ্রষ্ট ও কুপথগামী হবে। কারণ যে দায়িত্বানুভূতি মানুষকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে তা তার মধ্যে আদৌ সৃষ্টিই হতে পারবে না। তাই শয়তান মানুষকে আখেরাত থেকে গাফিল করে দেয়। এটিই তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং এর সাহায্যেই সে মানুষকে নিজের ফাঁদে আটকে ফেলে। যে ব্যক্তি তার এ প্রতারণা জাল ছিন্ন করে বের হয়ে আসে সে কখনো নিজের আসল চিরন্তন জীবনের স্বার্থকে দুনিয়ার এ সাময়িক জীবনের স্বার্থে কুরবানী করে দিতে রাজি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শয়তানের প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আখেরাতকে অস্বীকার করে বসে অথবা কমপক্ষে সে ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে সে কখনো এ দুনিয়ায় যে নগদ লাভ পেয়ে যাচ্ছে তা থেকে কেবলমাত্র এ জন্য হাত সংকুচিত করে নিতে রাজি হবে না যে এর ফলে পরবর্তী জীবনে ক্ষতি হবার আশংকা আছে। দুনিয়ায় যে ব্যক্তিই কখনো পথভ্রষ্ঠ হয়েছে তার পথভ্রষ্ঠতা এ আখেরাত অস্বীকার বা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কারণেই সংঘটিত হয়েছে এবং যে–ই সঠিক পথ অবলম্বন করেছে তার সঠিক কর্মের ভিত্তি আখেরাতের প্রতি ঈমানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩৭. কুরআন মজীদে সাবা জাতির ইতিহাসের প্রতি যে ইংগিত করা হয়েছে তা অনুধাবন করতে হলে এ জাতি সম্পর্কে ইতিহাসের অন্যান্য মাধ্যম থেকে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোও সামনে থাকা প্রয়োজন।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে সাবা দক্ষিণ আরবের একটি বৃহৎ জাতির নাম। কতগুলো বড় বড় গোত্র সমন্বয়ে এ জাতিটি গড়ে উঠেছিল। ইমাম আহমাদ ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবদুল বার ও তিরমিযী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। সাবা ছিল আরবের এক ব্যক্তির নাম। আরবে তার বংশ থেকে নিম্নোক্ত গোত্রগুলোর উদ্ভব হয় ঃ কিন্দাহ, হিম্‌য়ার, আয্‌দ, আশ'আরীন, মায্‌হিজ, আন্‌মার (এর দু'টি শাখা ঃ খাস্‌'আম ও বাজীলাহ), আমেলাহ, জুযান, লাখ্‌ম ও গাস্‌সান।

অতি প্রাচীনকাল থেকে আরবে এ জাতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে উর–এর শিলালিপিতে সাবোম নামের মধ্য দিয়ে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর ব্যবিলন ও আসিরিয়ার শিলালিপিতে এবং অনুরূপভাবে বাইবেলেও ব্যাপকহারে এর উল্লেখ দেখা যায়। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন যাবুর ৭২ ঃ ১৫, যিরমিয় ৬ ঃ ২০, যিহিস্কেল ২৭ ঃ ২২ ও ৩৮ ঃ ১৩ এবং ইয়োব ৬ ঃ ১৯) গ্রীক ও রোমীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ এবং ভূগোলবিদগণ থিয়োফ্রষ্টিসের (খৃঃ পূঃ ২৮৮) সময় থেকে খৃষ্ট পরবর্তী কয়েক শো বছর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এর আলোচনা করে এসেছেন।

এ জাতির আবাসভূমি ছিল আরবের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্তমানে ইয়ামন নামে পরিচিত এলাকাটি। এর উত্থানকাল শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব এগারো শো বছর থেকে। হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের যুগে একটি ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি হিসেবে সারা দুনিয়ায় এর নাম ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে এটি ছিল একটি সূর্যোপাসক জাতি। তারপর এর রাণী যখন হযরত সুলাইমানের (৯৬৫–৯২৬ খৃঃ পূঃ) হাতে ঈমান আনেন তখন জাতির বেশীর ভাগ লোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু পরে না জানি কোন্‌ সময় থেকে আবার তাদের মধ্যে শিরক ও মূর্তিপূজা প্রবল হয় এবং তারা আলমাকা (চন্দ্র দেবতা), 'আশতার (শুক্র) যাতে হামীম ও যাতে বা'দা (সূর্যদেবী), হোবস হারমতম বা হারীমত এবং এ ধরনের আরো বহু দেব–দেবীর পূজা করতে শুরু করে। আলমাকা ছিল এ জাতির সবচেয়ে বড় দেবতা। তাদের বাদশাহ নিজেকে এ দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করতো। ইয়ামনে এমন অসংখ্য শিলালিপি পাওয়া গেছে যা থেকে জানা যায়, সমগ্র দেশ উল্লেখিত দেবতাবৃন্দ বিশেষ করে আলমাকার মন্দিরে পরিপূর্ণ ছিল এবং প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতো।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইয়ামন থেকে প্রায় ৩ হাজার শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো সাবা জাতির ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে। এই সংগে আরবীয় ঐতিহ্য ও প্রবাদ এবং গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাস থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী একত্র করলে এ জাতির একটি বিস্তারিত ইতিহাস লেখা যেতে পারে। এসব তথ্যাবলীর দৃষ্টিতে তার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুগগুলো নিম্নভাবে বিবৃত করা যেতে পারে ঃ

এক ঃ খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দের পূর্ববর্তী যুগ। এ সময় সাবার রাজার উপাধি ছিল "মুকার্‌রিবে সাবা" (مكرب سبا)। সম্ভবত এখানে مكرب শব্দটি مقرب এর

সমার্থক ছিল। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ এ বাদশাহ মানুষ ও খোদাদের মধ্যে নিজেকে সংযোগ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করতেন। অথবা অন্যকথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন পুরোহিত বাদশাহ (Priest Kings) এ সময় তাঁর রাজধানী ছিল সারওয়াহ নগরীতে। মারিবের পশ্চিম দিকে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত খারীবাহ নামক স্থানে আজো এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ আমলে মারিবের বিখ্যাত বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাদশাহ এর সীমানা আরো সম্প্রসারিত করেন।

দুই ঃ খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১১৫ অব্দ পর্যন্ত সময়। এ সময় সাবার বাদশাহরা মুকাররিব উপাধি ত্যাগ করে মালিক (বাদশাহ) উপাধি গ্রহণ করেন। এর অর্থ হয়, রাজ্য পরিচালনায় ধর্মীয় ভাবধারার পরিবর্তে রাজনীতি ও সেকুলারিজমের রং প্রাধান্য লাভ করেছে। এ আমলে সাবার বাদশাহগণ সারওয়াহ ত্যাগ করে মারিবকে তাদের রাজধানী নগরীতে পরিণত করেন এবং এর অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। এ নগরটি সাগর থেকে ৩৯০০ ফুট উঁচুতে সানয়া থেকে ৬০ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। আজ পর্যন্ত এর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলো সাক্ষ দিচ্ছে যে, এক সময় এটি ছিল দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতির কেন্দ্রভূমি।

তিন ঃ ১১৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়। এ সময় সাবার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হিম্‌য়ার গোত্র প্রাধান্য লাভ করে। এটি ছিল সাবা জাতিরই অন্তরভুক্ত একটি উপজাতি। অন্যান্য উপজাতিদের থেকে এদের লোকসংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এ আমলে মারিবকে জনশূন্য করে যাইদানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ শহরটি ছিল হিম্‌য়ার গোত্রের কেন্দ্র। পরবর্তীকালে এ শহরটি যাফার নামে আখ্যায়িত হয়। বর্তমানে ইয়েরেম শহরের কাছে একটি গোলাকার পর্বতের ওপর এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং এরই কাছাকাছি এলাকায় হিম্‌য়ার নামে একটি ক্ষুদ্রাকার উপজাতির বসতি রয়েছে। একে দেখে কোন ব্যক্তি ধারণাই করতে পারবে না যে, এটি এমন একটি জাতির স্মৃতিচিহ্ন একদিন যার ডংকা নিনাদ সমগ্র বিশ্বে গুঞ্জরিত হতো। এ সময়ই রাজ্যের একটি অংশ হিসেবে ইয়াম্‌নত ও ইয়াম্‌নিয়াত শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এটি আরবের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত আসীর থেকে আদন (এডেন) এবং বাবুল মান্‌দাব থেকে হাদ্‌রামাউত পর্যন্ত সমগ্র এলাকার নামে পরিণত হয়। এ সময়ই সাবা জাতির পতন শুরু হয়।

চার ঃ ৩০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ইসলামের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত সময়। এটি ছিল সাবা জাতির ধ্বংসের সময়। এ সময় তাদের মধ্যে অনবরত গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। বাইরের জাতিসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষি ব্যবস্থা বরবাদ হয়ে যায়। শেষে জাতীয় স্বাধীনতারও বিলোপ ঘটে। প্রথমে যাইদানী, হিম্‌য়ারী ও হামদানীদের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ গ্রহণ করে ৩৪০ থেকে ৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়ামনে হাব্‌শীদের রাজত্ব চলে। তারপর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয় ঠিকই কিন্তু মারিবের বিখ্যাত বাঁধে ফাটল দেখা দিতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ৪৫০ বা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে এবং এর ফলে যে মহাপ্লাবন হয় তার উল্লেখ কুরআন মজীদের ওপরের আয়াতে করা হয়েছে। যদিও এরপর থেকে আব্‌রাহার সময় পর্যন্ত অনবরত বাঁধের মেরামত কাজ চলতে থাকে তবুও যে জনবসতি একবার স্থানচ্যুত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল তা পুনরায় আর একত্র হতে পারেনি এবং পানিসেচ ও কৃষির যে ব্যবস্থা একবার

বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল তার আর পুনরগঠন সম্ভবপর হয়নি। ৫২৩ খৃষ্টাব্দে ইয়ামনের ইহুদি বাদশাহ যু-নওয়াস নাজ্‌রানের খৃষ্টানদের ওপর যে জুলুম-নিপীড়ন চালায় কুরআন মজীদে আসহাবুল উখদুদ নামে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে হাবৃশার (আবিসিনিয়া এবং বর্তমানে ইথিওপিয়া) খৃষ্টান শাসক ইয়ামনের ওপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালান। তিনি সমগ্র দেশ জয় করে নেন। এরপর ইয়ামনের হাবৃশী গভর্ণর আব্‌রাহা কা'বা শরীফের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব খতম করার এবং আরবের সমগ্র পশ্চিম এলাকাকে রোমান-হাবশী প্রভাবাধীনে আনার জন্য ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের মাত্র কিছুদিন পূর্বে মক্কা মুআয্‌যমা আক্রমণ করে। এ অভিযানে তার সমগ্র সেনাদল যে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় কুরআন মজীদে আসহাবুল ফীল শিরোনামে তা উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ইরানীরা ইয়ামন দখল করে ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ইরানী গভর্ণর বাযান-এর ইসলাম গ্রহণের পর এ দখল দারিত্বের অবসান ঘটে।

সাবা জাতির উথান মূলত দুইটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক, কৃষি এবং দুই, ব্যবসায়। কৃষিকে তারা পানিসেচের একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত করে। প্রাচীন যুগে ব্যবিলন ছাড়া আর কোথাও এর সমপর্যায়ের পানিসেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সে দেশটি প্রাকৃতিক নদী সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল না। বর্ষাকালে পাহাড় থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত হতো। সারা দেশে এ ঝরণাগুলোতে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ বেঁধে তারা কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করতো। তারপর এ হ্রদগুলো থেকে খাল কেটে সারা দেশে এমনভাবে পানি সেচের ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিল যাকে কুরআন মজীদের বর্ণনামতে, যেদিকে তাকাও সেদিকেই কেবল বাগ-বাগিচা ও সবুজ-শ্যামল গাছ-গাছালি দেখা যেতো। এ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় জলাধারটি মারিব নগরীর নিকটবর্তী বাল্‌ক পাহাড়ের মধ্যস্থলের উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি যখন তাদের ওপর থেকে সরে গেলো তখন পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ বিশাল বাঁধটি ভেঙে গেলো। এ সময় এ থেকে যে বন্যা সৃষ্টি হলো তা পথের বাঁধগুলো একের পর এক ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চললো, এমনকি শেষ পর্যন্ত দেশের সমগ্র পানিসেচ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলো এবং এরপর আর কোনভাবেই এ ব্যবস্থা পুনরবহাল করা গেলো না।

ব্যবসায়ের জন্য এ জাতিকে আল্লাহ সর্বোত্তম ভৌগলিক স্থান দান করেছিলেন। তারা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। এক হাজার বছরের বেশী সময় পর্যন্ত এ জাতিটিই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসায়ের সংযোগ মাধ্যমের স্থান দখল করে থাকে। একদিকে তাদের বন্দরে চীনের রেশম, ইন্দোনেশিয়া ও মালাবারের গরম মশলা, হিন্দুস্তানের কাপড় ও তলোয়ার, পূর্ব আফ্রিকার যংগী দাস, বানর, উটপাখির পালক ও হাতির দাঁত পৌছে যেতো এবং অন্যদিকে তারা এ জিনিসগুলোকে মিসর ও সিরিয়ার বাজারে পৌছিয়ে দিতো। সেখান থেকে সেগুলো গ্রীস ও রোমে চলে যেতো। এ ছাড়াও তাদের নিজেদের এলাকায়ও উৎপন্ন হতো লোবান, চন্দন কাঠ, আম্বর, মিশ্‌ক, মুর, কারফা, কাস্‌বুখ, যারীরাহ, সালীখাহ ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে। মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও রোমের লোকেরা এগুলো লুফে নিতো।

দু'টি বড় বড় পথে এ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য চলতো। একটি ছিল সমুদ্রপথ এবং অন্যটি স্থলপথ। হাজার বছর পর্যন্ত সমুদ্রপথে ব্যবসায় ছিল সাবায়ীদের একচেটিয়া দখলে। কারণ

লোহিত সাগরের মৌসুমী বায়ু প্রবাহ, ভূগর্ভস্থ পাহাড় ও নোঙ্গর করার স্থানগুলোর গোপন তথ্য একমাত্র তারাই জানতো। অন্য কোন জাতির এ ভয়াল সাগরে জাহাজ চালাবার সাহসই ছিল না। এ সামদ্রিক পথে তারা জর্দান ও মিসরের বন্দরসমূহে নিজেদের পণ্যদ্রব্য পৌছিয়ে দিতো। অন্যদিকে স্থলপথ আদন (এডেন) ও হাদরামাউত থেকে মারিবে গিয়ে মিশতো এবং তারপর আবার সেখান থেকে একটি রাজপথ মক্কা, জেদ্দা, ইয়াসৃরিব, আল'উলা, তাবুক ও আইলা হয়ে পেট্টা পর্যন্ত পৌছে যেতো। এরপর একটি পথ মিসরের দিকে এবং অন্য পথটি সিরিয়ার দিকে যেতো। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, এ স্থলপথে ইয়ামন থেকে সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সাবায়ীদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত এ পথে যাওয়া আসা করতো। এ উপনিবেশগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর ধ্বংসাবশেষ এ এলাকায় আজো রয়ে গেছে এবং সেখানে সাবায়ী ও হিম্য়ারী ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি সময়ে এ ব্যবসায়ে অধোগতি শুরু হয়। মধ্যপ্রাচ্যে গ্রীক ও তারপর রোমানদের শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা এ মর্মে শোরগোল শুরু করে দেয় যে, আরব ব্যবসায়ীরা নিজেদের ইজারাদারীর কারণে প্রাচ্যের ব্যবসায় পণ্যের ইচ্ছামতো মূল্য আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে, এ ময়দানে অগ্রবর্তী হয়ে এ বাণিজ্য আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মিসরের গ্রীক বংশোদ্ভূত শাসক দ্বিতীয় বাতলিমূস (২৮৫–২৪৬ খৃঃ পূঃ) সেই প্রাচীন খালটি পুনরায় খুলে দেন, যা সতের শো বছর আগে ফেরাউন সিসুস্ত্রীস নীলনদকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করার জন্য এ খালটি খনন করেছিলেন। এ খালের মাধ্যমে মিসরের নৌবহর প্রথমবার লোহিত সাগরে প্রবেশ করে কিন্তু সাবায়ীদের মোকাবিলায় এ প্রচেষ্টা বেশী কার্যকর প্রমাণিত হতে পারেনি। তারপর রোমানরা যখন মিসর দখল করে তখন তারা লোহিত সাগরে অধিকতর শক্তিশালী বাণিজ্য বহর নিয়ে আসে এবং তার পশ্চাতভাগে একটি নৌবাহিনীও জুড়ে দেয়। এ শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা সাবায়ীদের ছিল না। রোমানরা বিভিন্ন বন্দরে নিজেদের ব্যবসায়িক উপনিবেশ গড়ে তোলে সেখানে জাহাজের প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে। যেখানে সম্ভব হয় সেখানে নিজেদের সামরিক বাহিনীও রেখে দেয়। শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় আসে যখন এডেনের ওপর রোমানদের সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সুযোগে রোমান ও হাবশী শাসকরা সাবায়ীদের মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে চক্রান্ত করে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত এ জাতির স্বাধীনতা সূর্যও অস্তমিত হয়।

নৌবাণিজ্য বেদখল হয়ে যাবার পর সাবায়ীদের হাতে থেকে যায় শুধুমাত্র স্থলপথের বাণিজ্য। কিন্তু নানাবিধ কারণে ধীরে ধীরে তারও কোমর ভেঙে যায়। প্রথমে নাবতীরা পেট্টা থেকে নিয়ে আল'উলা পর্যন্ত হিজায ও জর্দানের উচ্চভূমির সমস্ত উপনিবেশ থেকে সাবায়ীদেরকে বের করে দেয়। তারপর ১০৬ খৃষ্টাব্দে রোমানরা নাবৃতী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে হিজাযের সীমান্ত পর্যন্ত সিরিয়া ও জর্দানের সমস্ত এলাকা নিজেদের শক্ত হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। এরপর হাবশা ও রোম সাবায়ীদের পারস্পরিক সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে তাদের ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ কারণে হাবশীরা বারবার ইয়ামনের ব্যাপারে নাক গলাতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সারা দেশ অধিকার করে নেয়।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

৩ রুকূ'

(হে নবী।[৩৮] এ মুশরিকদেরকে) বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদকে তোমরা নিজেদের উপাস্য মনে করে নিয়েছো তাদেরকে ডেকে দেখো।[৩৯] তারা না আকাশে কোন অণু পরিমাণ জিনিসের মালিক, না পৃথিবীতে। আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানায় তারা শরীকও নয়। তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়। আর যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ শাফায়াত করার অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহর কাছে তার জন্য ছাড়া আর কারো জন্য কোন শাফায়াত উপকারী হতে পারে না।[৪০] এমনকি যখন মানুষের মন থেকে আশংকা দূর হয়ে যাবে তখন তারা (সুপারিশকারীদেরকে) জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, ঠিক জবাব পাওয়া গেছে এবং তিনি উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম।[৪১]

এভাবে আল্লাহর ক্রোধ এ জাতিকে উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে টেনে নামিয়ে এমন এক গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে যেখান থেকে কোন অভিশপ্ত জাতি আর কোনদিন বের হয়ে আসতে পারেনি। এক সময় ছিল যখন তার সম্পদশালিতার কথা শুনে গ্রীক ও রোমানরা ভীষণভাবে প্রলুব্ধ হতো। অষ্ট্রাবু লিখছেন ঃ তারা সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহার করতো। তাদের গৃহের ছাদ, দেয়াল ও দরোজায়ও হাতির দাঁত, সোনা, রূপা ও হীরা জহরতের কারুকাজে পরিপূর্ণ থাকতো। প্লিনি লিখেছেনঃ রোম ও পারস্যের সম্পদ তাদের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তারা তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। তাদের সবুজ–শ্যামল দেশ বাগ–বাগিচা, ক্ষেত–খামার ও গবাদি পশুতে পরিপূর্ণ। আর্টি মেড্রোস বলেন ঃ তারা বিলাসীতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। জ্বালানী কাঠের পরিবর্তে তারা দারুচিনি, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি কাঠ ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে অন্যান্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, তাদের এলাকার সমুদ্রোপকূল অতিক্রমকারী বিদেশী জাহাজগুলোতেও খোশ্‌বুর ছোঁয়াচ পৌঁছে যেতো। তারাই ইতিহাসে প্রথমবার সান'আর উচ্চ পার্বত্য স্থানসমূহে আকাশ ছোঁয়া (Skyscraper) ইমারত নির্মাণ করে। গুমদান প্রাসাদ নামে এগুলো দীর্ঘকাল ধরে প্রসিদ্ধ থাকে। আরব ঐতিহাসিকদের

বর্ণনা অনুযায়ী এগুলো ছিল ২০ তলা বিশিষ্ট ইমারত এবং প্রত্যেকটি তলার উচ্চতা ছিল ৩৬ ফুট। আল্লাহর অনুগ্রহ যতদিন তাদের সহযোগী ছিল ততদিন এসব কিছু ছিল। শেষে যখন তারা চরমভাবে অনুগ্রহ অস্বীকার করার এবং নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবার পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন মহান সর্বশক্তিমান রবের অনুগ্রহ দৃষ্টি তাদের ওপর থেকে চিরকালের জন্য সরে যায় এবং তাদের নাম নিশানা পর্যন্তও মুছে যায়।

৩৮. আগের দুই রুকূ'তে আখেরাত সম্পর্কে মুশরিকদের ভুল ধারণার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছিল। এবার শিরক্ খণ্ডন করার দিকে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৩৯. অর্থাৎ এখনই তোমরা দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম এবং সাবা জাতির আলোচনায় যেমন শুনলে সেভাবেই আল্লাহ ব্যক্তি, জাতি ও রাজ্যের ভাগ্য ভাঙা–গড়া করেন। এখন তোমাদের বানোয়াট উপাস্যদেরকে ডেকে দেখে নাও। তারাও কি কারো দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে এবং সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে?

৪০. অর্থাৎ কারো নিজে মালিক হয়ে বসা, মালিকানায় শরীক হওয়া অথবা আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া তো দূরের কথা সমগ্র বিশ্ব–জাহানে এমন কোন সত্তা নেই যে আল্লাহর সামনে কারো পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সুপারিশ পর্যন্ত করতে পারে। তোমরা এই ভুল ধারণা নিয়ে বসে রয়েছো যে, আল্লাহর এমন কিছু প্রিয়জন আছে অথবা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীনে এমন কিছু শক্তিশালী বান্দা আছে যারা একবার বেঁকে বসলে আল্লাহকে তাদের সুপারিশ মানতেই হবে। অথচ সেখানে অবস্থা হচ্ছে এই যে, অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ খোলার সাহসই করতে পারে না। যে অনুমতি লাভ করবে একমাত্র সে–ই কিছু নিবেদন করতে পারবে। আর যার পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি পাওয়া যাবে একমাত্র তার সপক্ষেই আবেদন নিবেদন করা যাবে। (সুপারিশের ইসলামী বিশ্বাস এবং সুপারিশের মুশরিকী বিশ্বাসের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস, ৫ ও ২৩; সূরা হূদ, ৮৪ ও ১০৬; আন নাহ্‌ল, ৬৪ ও ৭৯; সূরা তা–হা, ৮৬; আল আম্বিয়া, ২৭ এবং আল হাজ্জ ১২৫ টীকা দেখুন।

৪১. কিয়ামতের দিন কোন সুপারিশকারী যখন কারো পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি চাইবে তখনকার চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সে চিত্রে আমাদের সামনে যে অবস্থা ফুটে উঠছে তা হচ্ছে এই যে, অনুমতি চাওয়ার আবেদন পেশ করার পর সুপারিশকারী ও যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে তারা দু'জনই অত্যন্ত অস্থিরভাবে ভীতি ও উদ্বেগের সাথে জবাবের জন্য প্রতীক্ষারত। শেষ পর্যন্ত যখন ওপর থেকে অনুমতি এসে যায় এবং সুপারিশকারীর চেহারা দেখে যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে সে ব্যাপারটা আর উদ্বেগজনক নয় বলে অনুমান করতে থাকে তখন তার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে আসে। সে এগিয়ে গিয়ে সুপারিশকারীকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, "কি জবাব এসেছে?" সুপারিশকারী বলে, "ঠিক আছে, জবাব পাওয়া গেছে।" একথার মাধ্যমে যে বিষয়টি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, নির্বোধের দল! এ হচ্ছে যে দরবারের অবস্থা সে সম্পর্কে তোমরা কেমন করে এ ধারণা করতে পারলে যে সেখানে কেউ নিজের বল প্রয়োগ করে তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দেবে অথবা কারো সেখানে ধর্ণা দিয়ে বসে পড়ে আল্লাহকে একথা বলার সাহস হবে যে, এ ব্যক্তি আমার প্রিয়পাত্র এবং আমার লোক, একে মাফ করতেই হবে?

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

(হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, "কে তোমাদের আকাশসমূহ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করে?" বলো, "আল্লাহ,[৪২] এখন অবশ্যই আমরা অথবা তোমরা সঠিক পথে অথবা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত।"[৪৩] তাদেরকে বলো, "আমরা যে অপরাধ করেছি সে জন্য তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কিছু করছো সে জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না।"[৪৪]

৪২. প্রশ্ন ও জবাবের মাঝখানে একটি সূক্ষ্মতর শূন্যতা রয়েছে। সম্বোধন করা হয়েছিল মুশরিকদেরকে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব তো স্বীকার করতোই অধিকন্তু তাঁর হাতেই যে রিযিকের চাবিকাঠি রয়েছে একথাও জানতো এবং মানতো। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্যদেরকেও শরীক করতো। এখন যখন তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়, বলো কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দিচ্ছেন তখন তারা সমস্যায় পড়ে যায়। জবাবে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নাম নিলে তা নিজেদের ও নিজেদের জাতির আকিদা–বিশ্বাসের বিরোধী হয়ে যায় আবার হঠকারী হয়ে এমন কথা বলে দিলেও তাদের নিজেদের জাতির লোকেরাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে বলে আশংকা করে। আর যদি আল্লাহকেই রিযিকদাতা বলে মেনেই নেয় তাহলে তো সংগে সংগেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি সামনে এসে যায় যে, তাহলে অন্য সব উপাস্যরা কোন্ কাজের? এদেরকে তোমরা উপাস্য বানিয়ে রেখেছো কেন? রিযিক দেবেন আল্লাহ আর পূজা করা হবে এদেরকে, এটা কেমন কথা? তোমরা কি একেবারে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছো, এতটুকু কথাও বুঝো না? এই দ্বিবিধ সংকটে পড়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তারা 'আল্লাহ রিযিক দেন', একথাও বলে না, আবার একথাও বলে না যে, অন্য কোন মাবুদ রিযিক দেয়। প্রশ্নকারী যখন দেখছেন কোন জবাব আসছে না তখন তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আল্লাহ।"

৪৩. এ বাক্যাংশে প্রচার কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ওপরের প্রশ্ন ও জবাবের অনিবার্য ফলশ্রুতি এই ছিল যে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও উপাসনা করবে সে সঠিক পথে থাকবে এবং যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করবে সে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে। এ কারণে বাহ্যত এরপর একথাই বলা উচিত ছিল যে, আমরা সঠিক পথে আছি এবং তোমরা পথভ্রষ্ট। কিন্তু এ ধরনের স্পষ্টোক্তি সত্যকথনের দিক থেকে যতই সঠিক হোক না কেন প্রচার কৌশলের দিক থেকে মোটেই সঠিক হতো না। কারণ যখনই কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে আপনি সরাসরি তাকে পথভ্রষ্ট বলে দেবেন এবং নিজেকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করবেন তখনই সে জিদ ও

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

বলো, "আমাদের রব আমাদের একত্র করবেন, তারপর আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করে দেবেন। তিনি এমন পরাক্রমশালী শাসক যিনি সবকিছু জানেন।[৪৫] *তাদেরকে বলো, "আমাকে একটু দেখাও তো, কারা তারা যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করে রেখেছো।*[৪৬] *কখ্‌খনো না, প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান তো একমাত্র আল্লাহই।*

হঠকারিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে এবং সত্যের জন্য তার হৃদয় দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহর নবীকে যেহেতু শুধুমাত্র সত্য কথনের জন্য পাঠানো হয় না বরং তাঁর প্রতি এ দায়িত্বও আরোপিত থাকে যে, সর্বাধিক কৌশল অবলম্বন করে তিনি বিভ্রান্ত লোকদের সংশোধন করবেন, তাই আল্লাহ একথা বলেননি, হে নবী! এ প্রশ্ন ও জবাবের পরে এবার তুমি লোকদেরকে পরিষ্কার বলে দাও যে, তোমরা পথভ্রষ্ট এবং একমাত্র আমিই সঠিক পথে আছি। এর পরিবর্তে বরং এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে এখন এভাবে বুঝাও। তাদেরকে বলো, আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার এ পার্থক্য তো সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমরা এমন মাবুদকে মানি যিনি রিযিক দেন এবং তোমরা এমন সব সত্তাকে মাবুদে পরিণত করছো যারা রিযিক দেয় না। এখন আমাদের ও তোমাদের একই সাথে সঠিক পথাবলম্বী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। এ সুস্পষ্ট পার্থক্য সহকারে তো আমাদের মধ্য থেকে এক পক্ষই সঠিক পথাবলম্বী হতে পারে এবং অন্যপক্ষ অবশ্যই হবে পথভ্রষ্ট। এরপর তোমরা নিজেরাই চিন্তা করবে, যুক্তি ও প্রমাণ কার সঠিক পথাবলম্বী হবার পক্ষে রায় দিচ্ছে এবং সে দৃষ্টিতে কেইবা পথভ্রষ্ট।

৪৪. ওপরের বক্তব্য শ্রোতাদেরকে প্রথমেই চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। এরপর এই আরো একটি বাক্য বলা হলো। যাতে তারা আরো বেশী চিন্তা করার সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে তাদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, সঠিক পথ ও ভুল পথের এ বিষয়টির যথাযথ ফায়সালা করা আমাদের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থের দাবী। ধরে নেয়া যাক আমরা পথভ্রষ্ট, তাহলে এ ভ্রষ্টতার খেশারত আমাদেরকেই ভোগ করতে হবে, তোমরা এ জন্য পাকড়াও হবে না। তাই কোন আকিদা গ্রহণ করার আগে আমরা কোন ভুল পথে যাচ্ছি কিনা একথা ভালোভাবে চিন্তা করে নিতে হবে, এটা আমাদের নিজেদের স্বার্থের দাবী। অনুরূপভাবে আমাদের কোন স্বার্থে নয় বরং তোমাদের নিজেদের কল্যাণার্থেই একটি আকিদায় স্থির বিশ্বাস স্থাপন করার আগে তোমাদের ভালোভাবে চিন্তা–ভাবনা করে নিতে হবে কোথাও কোন বাতিল মতবাদের পেছনে তোমরা নিজেদের জীবনের সমস্ত মূলধন

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾

আর (হে নবী!) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে পাঠিয়েছি কিন্তু বেশীর ভাগ লোক জানে না।[৪৭]

তারা তোমাকে বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে সেই কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে?[৪৮] *বলো, তোমাদের জন্য এমন একটি দিনের মেয়াদ নির্ধারিত আছে যার আগমনের ব্যাপারে তোমরা এক মূহূর্ত বিলম্বও করতে পারো না আবার এক মুহূর্ত পূর্বেও তাকে আনতে পারো না।*[৪৯]

নিয়োগ করছো কিনা। এ ব্যাপারে হোচট খেলে তাতে ক্ষতিটা তোমাদেরই হবে, আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

৪৫. এটি এ ব্যাপারে চিন্তা করার প্রেরণা দানকারী শেষ ও সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি। শ্রোতাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ জীবনে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে হক ও বাতিলের বিরোধ রয়েছে এবং আমাদের দুই দলের মধ্য থেকে কোন একজনই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, এটাই শেষকথা নয় বরং এর পরে এটিও এক অকাট্য সত্য যে, আমাদের ও তোমাদের উভয় দলকেই নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে। আর রবও হচ্ছেন এমন যিনি প্রকৃত সত্য অবহিত আছেন এবং আমাদের উভয় দলের অবস্থাও ভালোভাবেই জানেন। সেখানে গিয়ে কেবলমাত্র আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কারা সত্য ও কারা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এ বিষয়টিরই চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে না বরং এ মামলারও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে যে, তোমাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য আমরা কি করেছি এবং তোমরা মিথ্যাপূজার জিদের বশবর্তী হয়ে কিভাবে আমাদের বিরোধিতা করেছো।

৪৬. অর্থাৎ এ উপাস্যদের ওপর ভরসা করে তোমরা এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথা পেতে নেবার আগে এখানেই আমাকে একটু জানিয়ে দাও, তাদের মধ্যে কে এমন শক্তিশালী আছে যে আল্লাহর আদালতে তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারবে এবং তোমাদেরকে তাঁর পাকড়াও থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে?

৪৭. অর্থাৎ কেবল এ শহর, এ দেশ বা এ যুগের লোকদের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য তোমাকে চিরন্তন নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তোমার এ সমকালীন স্বদেশীয় লোকেরা তোমার মর্যাদা বুঝে না। কত বড় মহান সত্তাকে তাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে সে ব্যাপারে কোন অনুভূতিই তাদের নেই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেবল তাঁর নিজের দেশ বা যুগের জন্য নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে, একথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে ঃ

وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ

"আর আমার প্রতি এ কুরআন অহীর সাহায্যে পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এবং যার কাছে এ বাণী পৌঁছে যায় তাকেই সতর্ক করে দেই।" (আল আন'আম, ১৯)

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"হে নবী! বলে দাও, হে মানবজাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রসূল।" (আল আ'রাফ, ১৫৮)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আর হে নবী! আমি পাঠিয়েছি তোমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই রহমত হিসেবে।" (আল আম্বিয়া, ১০৭)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

"বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন যাতে সে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারীতে পরিণত হয়।" (আল ফুরকান, ১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই একই বক্তব্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে পেশ করেছেন। যেমন ঃ

بعثت الى الاحمر والاسود

"আমাকে সাদা কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।" (মুসনাদে আহমাদ ঃ আবু মূসা আশ'আরী বর্ণিত)

اما انا فارسلت الى الناس كلهم عامة وكان من قبلى انما يرسل الى قومه

"আমাকে ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অথচ আমার আগে যে নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁকে তাঁর জাতির কাছে পাঠানো হতো।" (মুসনাদে আহমাদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণিত)

وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

"প্রথমে প্রত্যেক নবীকে বিশেষভাবে তাঁর জাতির কাছে পাঠানো হতো আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম ঃ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ۭ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ښ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ۨ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاۗءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ۝

৪ রুকূ'

এ কাফেররা বলে, "আমরা কখ্‌খনো এ কুরআন মানবো না এবং এর পূর্বে আগত কোন কিতাবকেও স্বীকার করবো না।"[৫০] হায়! যদি তোমরা দেখো এদের তখনকার অবস্থা যখন এ জালেমরা নিজেদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে সময় এরা একে অন্যকে দোষারোপ করবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তারা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে, "যদি তোমরা না থাকতে তাহলে আমরা মু'মিন হতাম।"[৫১] ক্ষমতাগর্বীরা সেই দমিত লোকদেরকে জবাবে বলবে, "তোমাদের কাছে যে সৎপথের দিশা এসেছিল তা থেকে কি আমরা তোমাদেরকে রুখে দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই তো অপরাধী ছিলে।"[৫২]

بعثت انا والساعة كهاتين يعنى اصبعين

"আমার আগমন ও কিয়ামতের অবস্থান এরূপ একথা বলতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দু'টি আঙুল উঠান।" (বুখারী ও মুসলিম)

এর অর্থ এই ছিল যে, "এ দু'টি আঙুলের মাঝখানে যেমন তৃতীয় কোন আঙুলের অন্তরাল নেই ঠিক তেমনি আমার ও কিয়ামতের মাঝখানেও অন্য কোন নবুওয়াতের অন্তরাল নেই। আমার পরে এখন আর শুধু রয়েছে কিয়ামত এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমিই নবী হিসেবে থাকবো।"

৪৮. অর্থাৎ যে সময় সম্পর্কে তুমি এইমাত্র বললে, "আমাদের রব আমাদের একত্র করবেন এবং আমাদের মধ্যে যথাযথ ফায়সালা করে দেবেন" সে সময়টি আসবে কবে? আমাদের ও তোমার মামলা চলছে দীর্ঘকাল থেকে। আমরা বারবার তোমার কথাকে

মিথ্যা বলেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করে আসছি। এখন এর ফায়সালা করা হচ্ছে না কেন?

৪৯. অন্যকথায় এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের ইচ্ছার অধীন নয়। কোন কাজের জন্য তোমরা যে সময় বেঁধে দেবে সে সময়ই সে কাজটি করতে তিনি বাধ্য নন। নিজের কাজ নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামতো তিনি করে থাকেন। তোমরা আল্লাহর পরিকল্পনা কি বুঝবে? তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব জাতি কতদিন পর্যন্ত এ দুনিয়ায় কাজ করার সুযোগ পাবে, কত ব্যক্তির এবং কত জাতির কি কি ধরনের পরীক্ষা হবে এবং এ দপ্তরের সমস্ত কাজকর্ম গুটিয়ে নেবার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের সবাইকে হিসেব-নিকেশের উদ্দেশ্যে ডেকে নেবার জন্য কোন্ সময়টি উপযোগী হবে তোমরা তার কি বুঝবে! আল্লাহরই পরিকল্পনায় এর যে সময়টি নির্ধারিত রয়েছে ঠিক সে সময়ই এ কাজটি হবে। তোমাদের তাগাদার কারণে সেটি এক সেকেণ্ড আগেও আসবে না এবং তোমাদের আবেদন নিবেদনের ফলে তা এক সেকেণ্ড বিলম্বিতও হবে না।

৫০. এখানে আরবের কাফেরদের কথা বলা হয়েছে, যারা কোন আসমানী কিতাবের কথা স্বীকার করতো না।

৫১. অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, যারা আজ দুনিয়ায় নিজেদের নেতা, সরদার, পীর ও শাসকদের অন্ধ অনুসারী এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন উপদেশদাতার কথায় কর্ণপাত করতে প্রস্তুত নয়, তারাই যখন প্রকৃত সত্য কি ছিল এবং তাদের নেতারা তাদেরকে কি বুঝাচ্ছিল তা স্বচক্ষে দেখবে এবং যখন তারা একথা জানতে পারবে যে, এ নেতাদের অনুসরণ তাদেরকে এ পরিণতির সম্মুখীন করে দিচ্ছে তখন তারা নিজেদের এসব মনীষীদের বিরুদ্ধে মারমুখো হবে এবং চিৎকার করে বলবে, হতভাগার দল! তোমরাই তো আমাদেরকে গোমরাহ করেছো। আমাদের সমস্ত বিপদের জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা আমাদের পথভ্রষ্ট না করলে আমরা আল্লাহ ও রসূলের কথা মেনে নিতাম।

৫২. অর্থাৎ তারা বলবে, আমাদের কাছে এমন কোন শক্তি ছিল না যার সাহায্যে আমরা মাত্র গুটিকয় মানুষ তোমাদের মতো কোটি কোটি মানুষকে জোরপূর্বক নিজেদের আনুগত্য করতে বাধ্য করতে পারতাম। যদি তোমরা ঈমান আনতে চাইতে তাহলে আমাদের সরদারি, নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের সিংহাসন উল্‌টে ফেলে দিতে পারতে। আমাদের সেনাদল তো তোমরাই ছিলে। আমাদের শক্তি ও সম্পদের উৎস্য তো ছিল তোমাদেরই হাতে। তোমরা নজরানা ও ট্যাক্স না দিলে তো আমরা বিত্তহীনই থাকতাম। তোমরা আমাদের হাতে বাইয়াত না করলে আমাদের পীরালী একদিনও চলতো না। তোমরা জিন্দাবাদের শ্লোগান না দিলে কেউ আমাদের কথা জিজ্ঞেসও করতো না। তোমরা আমাদের সৈন্য হয়ে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত না হলে একজন মানুষের অপরও আমাদের প্রভাব বিস্তৃত হতে পারতো না। এখন একথা মেনে নিচ্ছো না কেন যে, আসলে রসূলগণ তোমাদের সামনে যে পথ পেশ করে ছিলেন তোমরা নিজেরাই তার ওপর চলতে চাচ্ছিলে না? তোমরা ছিলে নিজেদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দাস। আর তোমাদের প্রবৃত্তির এ চাহিদা রসূলদের দেখানো তাকওয়ার পরিবর্তে আমাদের এখানেই পূর্ণ হতো। তোমরা হালাল ও হারামের পরোয়া না করে দুনিয়াবী আয়েশ ও আরামের প্রত্যাশী ছিলে এবং আমাদের কাছেই তোমরা তার সন্ধান পাচ্ছিলে। তোমরা এমন সব পীরের সন্ধানে

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ
لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلٰلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ
هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ
إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۙ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ
أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۙ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

সেই দমিত লোকেরা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে, "না, বরং দিবারাত্রের চক্রান্ত ছিল যখন তোমরা আমাদের বলতে আমরা যেন আল্লাহর কুফরী করি এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ উপস্থাপন করি।"[৫৩] শেষ পর্যন্ত যখন তারা আযাব দেখবে তখন মনে মনে পস্তাতে থাকবে এবং আমি এ অস্বীকারকারীদের গলায় বেড়ী পরিয়ে দেবো। লোকেরা যেমন কাজ করেছিল তেমনি প্রতিদান পাবে, এ ছাড়া আর কোন প্রতিদান কি তাদেরকে দেয়া যেতে পারে?

কখনো এমনটি ঘটেনি যে, আমি কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি এবং সেই জনপদের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা একথা বলেনি যে, তোমরা যে বক্তব্য নিয়ে এসেছো আমরা তা মানি না।[৫৪] তারা সবসময় একথাই বলেছে, আমরা তোমাদের চাইতে বেশী সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী এবং আমরা কখ্খনো শাস্তি পাবো না।[৫৫] হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, আমার রব যাকে চান প্রশস্ত রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোকা দান করেন কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এর প্রকৃত তাৎপর্য জানে না।[৫৬]

ছিলে যারা তোমাদের সব রকমের পাপ কাজ করার ব্যাপক অনুমতি দিতো এবং সামান্য কিছু নজরানা নিয়ে তোমাদের পাপ মোচনের দায়িত্ব নিজেদের মাথায় তুলে নিতো। তোমরা এমনসব পণ্ডিত ও মৌলবীদের সন্ধানে ফিরছিলে যারা প্রত্যেকটি শির্ক ও বিদ'আত এবং তোমাদের প্রত্যেকটি মনের মতো জিনিসকে প্রকৃত সত্য প্রমাণ করে তোমাদেরকে খুশী ও তোমাদের স্বার্থ উদ্ধার করে দিতো। তোমাদের এমনসব জালিয়াতের

প্রয়োজন ছিল যারা আল্লাহর দীনকে পরিবর্তিত করে তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা অনুযায়ী একটি নতুন দীন তৈরি করে দিতে পারতো। তোমাদের এমন নেতার প্রয়োজন ছিল যারা পরকাল সমৃদ্ধ হোক বা উৎসন্নে যাক তার পরোয়া না করে যে কোনভাবেই হোক না কেন তোমাদের দুনিয়াবি স্বার্থ উদ্ধার করে দিতে পারলেই যথেষ্ট। তোমাদের এমন সব শাসকের প্রয়োজন ছিল যারা নিজেরাই হবে অসচ্চরিত্র ও অবিশ্বস্ত এবং তাদের পৃষ্ঠপোশকতায় তোমরা সব রকমের গোনাহ ও অসৎ কাজ করার অবাধ সুযোগ লাভ করবে। এভাবে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান সমান লেনদেনের কথা হয়েছিল। এখন তোমরা এ কেমন ভড়ং সৃষ্টি করে চলেছো, যেন তোমরা বড়ই নিরপরাধ এবং আমরা জোর করে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম।

৫৩. অন্যকথায় এ জনতার জবাব হবে, তোমরা এ দায়িত্বের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সমান অংশীদার করছো কেমন করে? তোমাদের কি মনে আছে, তোমরা চালবাজী, প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারণার কেমন মোহময় যাদু সৃষ্টি করে রেখেছিলে এবং রাতদিন আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের ফাঁদে আটকাবার জন্য কেমন সব পদক্ষেপ নিয়েছিলে? তোমরা আমাদের সামনে দুনিয়া পেশ করেছিলে এবং আমরা তার জন্য জান দিয়ে দিলাম, ব্যাপারতো মাত্র এতটুকুই ছিল না বরং তোমরা রাতদিনের প্রতারণা ও চালাকির মাধ্যমে আমাদেরকে বেকুব বানাচ্ছিলে এবং তোমাদের প্রত্যেক শিকারী প্রতিদিন একটি নতুন জাল তৈরি করে নানা ছলচাতুরী ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাতে ফাঁসিয়ে দিচ্ছিল, এটাও ছিল বাস্তব ঘটনা।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নেতা ও পীরদের এই বিবাদের উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন ঃ আ'রাফ, ৩৮-৩৯; ইবরাহীম, ২১; আল কাসাস, ৬৩; আল আহযাব, ৬৬-৬৮; আল মু'মিন, ৪৭-৪৮ এবং হা মীম আস্ সাজদাহ, ২৯ আয়াত।

৫৪. একথা কুরআন মজীদের বহুস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতকে সর্বপ্রথম ও সবার আগে রুখে দাঁড়াতো সমাজের সচ্ছল শ্রেণী, যারা অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন ঃ আল আন'আম, ১২৩; আল আ'রাফ, ৬০, ৬৬, ৭৫, ৮৮, ৯০; হূদ, ২৭; বনী ইসরাঈল, ১৬; আল মু'মিনূন, ২৪, ৩৩ থেকে ৩৮, ৪৬, ৪৭ এবং আয্ যুখ্রুফ, ২৩ আয়াত।

৫৫. তাদের যুক্তি ছিল, আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহর বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয় লোক। তাইতো তিনি আমাদের এমন নিয়ামত দান করেছেন যা থেকে তোমরা বঞ্চিত অথবা কমপক্ষে আমাদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের। আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকতেন, তাহলে আমাদের এ শানশওকত ও অর্থ-বিত্ত কেনই বা দিলেন ঃ এখন আল্লাহ এখানে তো আমাদের প্রতি অঢেল অনুগ্রহ বর্ষণ করছেন আর আখেরাতে আমাদেরকে শাস্তি দেবেন, একথা আমরা কেমন করে মেনে নিতে পারি। শাস্তি দিলে তাদেরকেই দেবেন যারা এখানে তাঁর অনুগ্রহ বঞ্চিত হয়েছে।

কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে দুনিয়া পূজারীদের এ বিভ্রান্তির উল্লেখ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন ঃ আল বাকারাহ, ১২৬, ২১২; আত

وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُم بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

৫ রুকূ'

তোমাদের এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে; হাঁ, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।[৫৭] এরাই এমন লোক যাদের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান এবং তারা সুউচ্চ ইমারতসমূহে নিশ্চিন্তে-নিরাপদে থাকবে।[৫৮] যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তারা শাস্তি ভোগ করবে।

হে নবী! তাদেরকে বলো, "আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান মুক্ত হস্তে রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোপা দেন।[৫৯] যা কিছু তোমরা ব্যয় করে দাও তার জায়গায় তিনি তোমাদের আরো দেন, তিনি সব রিযিকদাতার চেয়ে ভালো রিযিকদাতা।"[৬০]

তাওবা, ৫৫, ৬৯; হূদ, ৩, ২৭; আর রা'দ, ২৬; আল কাহ্‌ফ, ৩৪-৪৩; মার্‌য়াম, ৭৩-৭৭; তা-হা, ১৩১; আল মু'মিনূন, ৫৫-৬১; আশ্ শু'আরা, ১১১; আল কাসাস, ৭৬-৮৩; আর্ রূম, ৯; আল মুদ্দাস্‌সির, ১১-২৬ এবং আল ফাজর, ১৫-২০ আয়াত।

৫৬. অর্থাৎ দুনিয়ায় রিযিক বন্টনের ব্যবস্থা যে জ্ঞান, কৌশল ও কল্যাণ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা তারা অনুধাবন করে না। ফলে তারা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ যাকে প্রশস্ত রিযিক দান করেন সে তাঁর প্রিয়পাত্র এবং যার রিযিক তিনি সংকীর্ণ করে দেন সে তাঁর গযবের মুখোমুখি হয়েছে। অথচ কোন ব্যক্তি সামান্য চোখ মেলে তাকালে দেখতে পারে, অনেক সময় বড়ই নোংরা ও ভয়ংকর চরিত্রের লোকেরা বিত্ত ও সম্পদশালী হয়েছে এবং আয়েশী জীবন যাপন করছে, পক্ষান্তরে অনেক সৎকর্মশীল ও ভদ্রলোক, যাদের চরিত্র গুণ সবার স্বীকৃতি পেয়েছে, তারা আর্থিক অনটনে জীবন যাপন করছে। এখন কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে পারে, আল্লাহ এ পাক-পবিত্র চরিত্রের

অধিকারী লোকদেরকে অপছন্দ করেন এবং দুষ্ট প্রকৃতির শয়তান চরিত্রের লোকদেরকেই ভালোবাসেন?

৫৭. এর দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টিই সঠিক। এক, ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি আল্লাহর নিকটবর্তী করার মতো জিনিস নয়। বরং ঈমান ও সৎকাজ মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। দুই, সম্পদ ও সন্তান একমাত্র এমন সৎ মু'মিনের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে পরিণত হতে পারে, যে নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং নিজের সন্তানকে উত্তম শিক্ষা ও অনুশীলন দান করে তাকে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ও সৎকর্মশীল করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

৫৮. এর মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, তাঁর এ নিয়ামত হবে অবিনশ্বর এবং এর প্রতিদানের ধারাবাহিকতা কোনদিনই ছিন্ন বা ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে না। কারণ যে আয়েশ আরামের কখনো খতম হয়ে যাবার আশংকা থাকে, মানুষ পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে তা উপভোগ করতে পারে না। এ ব্যাপারে সবসময় ভয় থাকে কি জানি কখন এসব কিছু ছিনিয়ে নেয়া হবে।

৫৯. এ বিষয়টিকে পুনরুক্তি সহকারে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথার ওপর জোর দেয়া যে, রিযিক কম বেশী হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত, তাঁর সন্তুষ্টির সাথে নয়। আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ভালো–মন্দ সব রকমের মানুষ রিযিক লাভ করছে। যারা আল্লাহকে মেনে নিয়েছে তারাও রিযিক পাচ্ছে এবং যারা অস্বীকার করেছে তারাও। প্রচুর রিযিক লাভ রিযিক লাভকারীর আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবার কথা প্রমাণ করে না। আবার অন্যদিকে কম রিযিক লাভ বা রিযিকের অভাব অভাবগ্রস্তের প্রতি আল্লাহর ক্রোধান্বিত হবার আলামত পেশ করে না। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী একজন জালেম এবং বেঈমান লোকও আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। অথচ জুলুম ও বেঈমানী আল্লাহ পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে আল্লাহরই ইচ্ছার অধীনে একজন সত্যাশ্রয়ী ও ঈমানদার ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও কষ্ট সহ্য করতে থাকে অথচ আল্লাহ সত্যবাদিতা ও ঈমানদারী পছন্দ করেন। কাজেই বস্তুগত স্বার্থ ও মুনাফা অর্জনকে যে ব্যক্তি ভালো ও মন্দের মাপকাঠি গণ্য করে সে বিরাট ভুলের শিকার ও পথভ্রষ্ট। আসল জিনিস হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং এটি অর্জিত হয় এমন সব নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। এ গুণাবলীর সাথে কেউ যদি দুনিয়ার নিয়ামতগুলোও লাভ করে, তাহলে নিসন্দেহে তা হবে আল্লাহর দান এবং এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি নৈতিক গুণাবলীর দিক দিয়ে আল্লাহর বিদ্রোহী ও নাফরমান বান্দা হয়ে থাকে এবং এ সংগে তাকে দুনিয়ার নিয়ামতও দান করা হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে কঠিন জবাবদিহি ও নিকৃষ্টতম শাস্তি ভোগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৬০. রিযিকদাতা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, দাতা এবং এ ধরনের আরো বহু গুণ রয়েছে, যা আসলে আল্লাহরই গুণ কিন্তু রূপক অর্থে বান্দাদের সাথেও সংশ্লিষ্ট করা হয়। যেমন আমরা এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলি, সে অমুক ব্যক্তির রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অথবা সে এ উপহারটি দিয়েছে। কিংবা সে অমুক জিনিসটি তৈরি করেছে বা উদ্ভাবন করেছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ নিজের জন্য 'উত্তম রিযিক দাতা' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

আর যেদিন তিনি সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশ্‌তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, “এরা কি তোমাদেরকেই পূজা করতো?”[৬১] তখন তারা জবাব দেবে, “পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে নয়।[৬২] আসলে এরা আমাদের নয় বরং জিনদের পূজা করতো, এদের অধিকাংশ তাদেরই প্রতি ঈমান এনেছিল।”[৬৩] (তখন আমি বলবো ঃ) আজ তোমাদের কেউ কারো উপকারও করতে পারবে না অপকারও করতে পারবে না এবং জালেমদেরকে আমি বলে দেবো, এখন আস্বাদন করো এ জাহান্নামের আযাবের স্বাদ, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করে থাকো যে, তারা রুজি দান করে থাকে তাদের সবার চেয়ে আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা।

৬১. প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে দেব-দেবী মনে করে তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে আসছে। বৃষ্টির দেবতা, বিজলীর দেবতা, বায়ুর দেবতা, ধন-সম্পদের দেবী, মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবী ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিসের পৃথক দেবতা বা দেবীর মূর্তি তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরই সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, কিয়ামতের দিন এই ফেরেশ্‌তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরাই কি এদের উপাস্য হয়েছিলে? নিছক অবস্থা অনুসন্ধান করা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয় বরং এর মধ্যে এই অর্থও নিহিত রয়েছে যে, তোমরা কি তাদের পূজা-অর্চনায় রাজি ছিলে? কিয়ামতে এ প্রশ্ন কেবল ফেরেশ্‌তাদেরকেই করা হবে না বরং দুনিয়ায় যাদের ইবাদাত ও পূজা করা হয় তাদেরকেও করা হবে। তাই সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ –

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

এদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন এরা বলে, "এ ব্যক্তি তো চায় তোমাদের বাপ–দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করে এসেছে তাদের থেকে তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে।" আর বলে, "এ (কুরআন) নিছক একটি মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।" এ কাফেরদের সামনে যখনই সত্য এসেছে তখনই এরা বলে দিয়েছে, "এ তো সুস্পষ্ট যাদু।" অথচ না আমি এদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছিলাম, যা এরা পড়তো, আর না তোমার পূর্বে এদের কাছে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।[৬৪] এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরা মিথ্যা আরোপ করেছিল। যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তার এক–দশমাংশেও এরা পৌছুতে পারেনি কিন্তু যখন তারা আমার রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো তখন দেখে নাও আমার শাস্তি ছিল কেমন কঠোর।[৬৫]

"যেদিন আল্লাহ এদেরকে এবং যেসব সত্তার এরা ইবাদাত করতো তাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার এ বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না এরা নিজেরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল?" (১৭ আয়াত)

৬২. অর্থাৎ তারা জবাব দেবে, অন্য কেউ খোদায়ী ও উপাস্য হবার ব্যাপারে আপনার সাথে শরীক হবে আপনার সত্তা এ থেকে পাক–পবিত্র এবং এর অনেক অনেক উর্ধে। এ লোকগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এদের এবং এদের কাজ–কারবারের কোন দায়–দায়িত্ব আমাদের ওপর নেই। আমরা তো আপনার বান্দা।

৬৩. এ বাক্যাংশে জিন বলতে জিনদের মধ্যকার শয়তানদের কথা বুঝানো হয়েছে। ফেরেশ্তাদের এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, বাহ্যত এরা আমাদের নাম নিয়ে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী আমাদের মূর্তি বানিয়ে যেন আমাদেরই ইবাদাত করতো কিন্তু আসলে আমাদের নয় বরং এরা ইবাদাত করতো শয়তানের। কারণ শয়তানরাই তাদেরকে এ পথ

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۫ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾

৬ রুকূ'

হে নবী! এদেরকে বলে দাও, "আমি তোমাদেরকে একটিই উপদেশ দিচ্ছি ঃ আল্লাহর জন্য তোমরা একা একা এবং দু'জন দু'জন মিলে নিজেদের মাথা ঘামাও এবং চিন্তা করো। তোমাদের সাথির মধ্যে এমন কি কথা আছে যাকে প্রলাপ বলা যায়?[৬৬] সেতো একটি কঠিন শাস্তি আসার আগে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে।"[৬৭] এদেরকে বলো, "যদি আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চেয়ে থাকি তাহলে তা তোমাদের জন্যই থাকুক।[৬৮] আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আল্লাহরই এবং তিনি সব জিনিসের ওপর সাক্ষী।"[৬৯]

দেখিয়েছিল। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে করার এবং তাদের সামনে নজরানা পেশ করার জন্য শয়তানরাই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

যারা জিনদেরকে পার্বত্য এলাকার অধিবাসী এবং গ্রামীণ ও মরু এলাকার মানুষ অর্থে গ্রহণ করেন এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে তাদের সে চিন্তা ভুল বলে প্রমাণিত করে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এ আয়াতটি পড়ে এরূপ ভাব্তে পারে যে, লোকেরা পাহাড়ী, মরুচারী ও গ্রামীণ লোকদের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তাদের ইবাদাত করতো?

এ আয়াত থেকে ইবাদাতের অন্য একটি অর্থের ওপরও আলোকপাত করা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, ইবাদাত কেবল উপাসনা, আরাধনা ও পূজা–অর্চনারই নাম নয়। বরং কারো নির্দেশে চলা এবং চোখ–কান বন্ধ করে তার আনুগত্য করাও ইবাদাত। এমনকি মানুষ যদি কাউকে অভিশাপ দেয় (যেমন শয়তানদেরকে অভিশাপ দেয়) এবং তারপরও তারই পথ অনুসরণ করে চলে তাহলেও সে তারই ইবাদাত করছে। এর অন্য দৃষ্টান্তগুলোর জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসা, ১৪৫; আল মা–য়েদাহ, ৯১; আত্ তাওবা, ৩১; মার্য়াম, ২৭ এবং আল কাসাস, ৮৬ টীকা।

৬৪. অর্থাৎ এর পূর্বে না এমন কোন কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর না এমন কোন রসূল আসেন, যিনি এসে তাদেরকে এমন শিক্ষা দেন, যার ফলে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী ও পূজা করতো। তাই তারা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় পুরোপুরি মূর্খতা ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত অস্বীকার করছে। এর সপক্ষে তাদের কাছে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই।

৬৫. অর্থাৎ এ জাতিগুলো যে পরিমাণ শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল মক্কার লোকেরা তার দশ ভাগের একভাগও অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু নবীগণ তাদের সামনে যে সত্য পেশ করেছিলেন তা মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছিল এবং মিথ্যার ওপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থার ভিত্ রচনা করেছিল। এর ফলে শেষ পর্যন্ত তারা কিভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের শক্তি ও ধন–সম্পদ তাদের কোন কাজে লাগেনি তা তোমরা নিজেরাই দেখে নাও।

৬৬. অর্থাৎ স্বার্থ কামনা ও বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে একান্ত আল্লাহর ওয়াস্তে চিন্তা করে দেখো। প্রত্যেক সদুদ্দেশ্যে আলাদা আলাদাভাবেও চিন্তা করো আবার দু'জন চারজন মিলে মিশে একসাথে বসেও নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে পরস্পর বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে এ মর্মে অনুসন্ধান চালাও যে, গতকাল পর্যন্তও যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করছিলে তাকে আজ কিসের ভিত্তিতে পাগল গণ্য করছো? নবুওয়াত লাভের মাত্র কিছুকাল আগেই তো একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কা'বাঘর পুনরনির্মাণের পর হাজ্‌রে আসওয়াদ সংস্থাপনের প্রশ্নে কুরাইশের গোত্রগুলো যখন পরস্পর লড়াই করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন তোমরাই তো একযোগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরোধ মীমাংসাকারী বলে স্বীকার করে নিয়েছিলে এবং তিনি এমনভাবে তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলে। তোমাদের সমগ্র জাতি যে ব্যক্তির বুদ্ধি–জ্ঞান সম্পর্কে এ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এখন এরপর এমন কি ঘটনা ঘটে গেলো যার ফলে তোমরা তাকে পাগল বলতে শুরু করেছো? হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমির কথা তো আলাদা কিন্তু সত্যই কি তোমরা মুখে যা বলছো নিজেদের মনেও সেটাকেই সত্য বলে মনে করে থাকো?

৬৭. অর্থাৎ এ অপরাধের ভিত্তিতেই কি তোমরা তাকে মানসিক রোগী বলে গণ্য করছো? তোমাদের মতে বুদ্ধিমান কি এমন ব্যক্তিকেই বলা হবে যে তোমাদের ধ্বংসের পথে যেতে দেখে বলবে, শাবাশ, বড়ই চমৎকার পথে যাচ্ছো এবং পাগল বলা হবে তাকে যে তোমাদেরকে দুঃসময় আসার আগে সতর্ক করে দেবে এবং বিপর্যয়ের পরিবর্তে সংশোধনের পথ বাতলাবে?

৬৮. মূলে বলা হয়েছে ঃ مَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ এর একটি অর্থ আমি ওপরে অনুবাদে বলেছি। এর দ্বিতীয় একটি অর্থ এও হতে পারে, তোমাদের কল্যাণ ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না এবং তোমরা ঠিক হয়ে যাও, এটিই আমার পুরস্কার। এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلاً

"হে নবী! তাদেরকে বলো, তোমাদের কাছ থেকে এ কাজের জন্য এ ছাড়া আর কোন প্রতিদান আমি চাই না যে, যে চায় সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।"

(আল ফুরকান, ৫৭)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

এদেরকে বলো, "আমার রব (আমার প্রতি) সত্যের প্রেরণা দান করেন[৭০] এবং তিনি সমস্ত গোপন সত্য জানেন।" বলো, "সত্য এসে গেছে এবং এখন মিথ্যা যত চেষ্টাই করুক তাতে কিছু হতে পারে না।" বলো, "যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আমার পথভ্রষ্টতার শাস্তি আমারই প্রাপ্য আর যদি আমি সঠিক পথে থেকে থাকি, তাহলে তা হবে আমার রব আমার প্রতি যে অহী নাযিল করেন তারই ভিত্তিতে। তিনি সবকিছু শোনেন এবং নিকটেই আছেন।[৭১]

৬৯. অর্থাৎ অপবাদদাতারা যা ইচ্ছা অপবাদ দিক কিন্তু আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সাক্ষী আছেন, আমি নিস্বার্থ এবং নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে আমি এ কাজ করছি না।

৭০. মূল শব্দ হচ্ছে, يَقْذِفُ بِالْحَقِّ এর একটি অর্থ হচ্ছে, অহীর মাধ্যমে তিনি সত্য জ্ঞান আমাকে দান করেন। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তিনি সত্যকে বিজয়ী করেন এবং মিথ্যার মাথায় সত্যের আঘাত হানেন।

৭১. এ যুগের কোন কোন লোক এ আয়াত থেকে একথা প্রমাণ করেন যে, এর দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথভ্রষ্ট হতে পারতেন বরং হয়ে যেতেন। তাইতো মহান আল্লাহ নিজেই নবী করীমের (সা) মুখে একথা বলে দিয়েছেন যে, যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তাহলে আমার পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী হবো আমি নিজেই এবং আমি তখনই সঠিক পথে থাকি যখন আমার রব আমার প্রতি অহী (অর্থাৎ কুরআনের আয়াত) নাযিল করেন। এ ভুল ব্যাখ্যার সাহায্যে এ জালেমরা যেন একথা প্রমাণ করতে চায় যে, নবী করীমের (সা) জীবন ছিল নাউযুবিল্লাহ সঠিক পথে চলা ও ভুল পথে চলার সমাহার এবং মহান আল্লাহ কাফেরদের সামনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ স্বীকারোক্তি এ জন্য করিয়েছিলেন যে, কোন ব্যক্তি যেন তাঁকে পুরোপুরি সঠিক পথে রয়েছেন মনে করে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য না করে বসে। অথচ যে ব্যক্তিই বক্তব্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে চিন্তা করবে সেই বুঝতে পারবে যে, এখানে "যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকি" কথাটার অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী করীম (সা) সত্যিসত্যি বিভ্রান্ত হয়ে যেতেন, বরং পুরো কথাটাই এ অর্থে বলা হয়েছে যে, "যদি আমি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকি, যেমন তোমরা আমার প্রতি অপবাদ দিচ্ছো এবং আমার এ নবুওয়াতের দাবী এবং আমার এ তাওহীদের দাওয়াত এই বিভ্রান্তিরই ফল, যেমন তোমরা ধারণা করছো, তাহলে আমার বিভ্রান্তির দায় আমার ওপরই পড়বে, এর দায়ে তোমরা পাকড়াও হবে না। কিন্তু যদি আমি সঠিক পথে থাকি, যেমন যথার্থই আমি আছি, তাহলে তার কারণ হচ্ছে

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُوا۟ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا۟ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ فِى شَكٍّ مُّرِيبٍۭ ﴿٥٤﴾

আহা, যদি তুমি দেখতে তাদেরকে সে সময় যখন তারা ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং কোথাও নিরাপদে বের হয়ে যেতে পারবে না বরং নিকট থেকেই পাকড়াও হয়ে যাবে।[৭২] সে সময় তারা বলবে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম,[৭৩] অথচ এখন দূরে চলে যাওয়া জিনিস নাগালের মধ্যে আসতে পারে কেমন করে?[৭৪] ইতিপূর্বে তারা কুফরী করেছিল এবং আন্দাজে বহুদূর থেকে কথা নিয়ে আসতো।[৭৫] সে সময় তারা যে জিনিসের আকাংখা করতে থাকবে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে যেমনটি তাদের পূর্বসূরী সমপন্থীরা বঞ্চিত হয়েছিল। তারা বড়ই বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পতিত ছিল।[৭৬]

এই যে, আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে অহী আসে, যার মাধ্যমে আমি সঠিক পথের জ্ঞান লাভ করেছি। আমার রব কাছেই আছেন। তিনি সবকিছু শুনছেন। আমি পথহারা অথবা তাঁর দিকে যাবার পথের সন্ধান পেয়েছি, তা তিনি জানেন।

৭২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অপরাধী এমনভাবে পাকড়াও হবে যেন মনে হবে পাকড়াওকারী কাছেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। অপরাধী সামান্য একটু পালাবার চেষ্টা করার সাথে সাথেই যেন তাকে ধরে ফেলেছে।

৭৩. অর্থ হচ্ছে, এমন শিক্ষার প্রতি ঈমান আনলাম যা রসূল দুনিয়ায় পেশ করেছিলেন।

৭৪. অর্থাৎ ঈমান আনার জায়গা ছিল দুনিয়া। সেখান থেকে এখন তারা বহুদূরে চলে এসেছে। আখেরাতের জগতে পৌঁছে যাবার পর এখন আর তাওবা করা ও ঈমান আনার সুযোগ কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

৭৫. অর্থাৎ রসূল, রসূলের শিক্ষা এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপবাদ দিতো, বিদ্রূপাত্মক শব্দ উচ্চারণ করতো ও ধ্বনি দিতো। কখনো বলতো, এ ব্যক্তি যাদুকর, কখনো বলতো পাগল। কখনো তাওহীদ নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করতো আবার কখনো আখেরাতের ধারণাকে উপহাস করতো। কখনো এই মর্মে গল্প তৈরি করতো যে,

রসূলকে অন্য কেউ পড়িয়ে ও শিখিয়ে দেয় আবার কখনো মু'মিনদের ব্যাপারে বলতো, এরা শুধুমাত্র নিজেদের অজ্ঞতার কারণে রসূলের অনুসারী হয়েছে।

৭৬. আসলে শির্‌ক, নাস্তিক্যবাদ ও আখেরাত অস্বীকার করার বিশ্বাস কোন ব্যক্তি নিশ্চয়তার ভিত্তিতে গ্রহণ করে না এবং করতে পারে না। কারণ নিশ্চয়তা একমাত্র সঠিক জ্ঞান ও জানার ভিত্তিতেই অর্জিত হতে পারে। আর আল্লাহ নেই অথবা বহু আল্লাহ আছে কিংবা বহু সত্তা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী অথবা পরকাল হওয়া উচিত নয় ইত্যাকার বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন ব্যক্তিরই সঠিক জ্ঞান নেই। কাজেই যে ব্যক্তিই দুনিয়ায় এ আকীদা-বিশ্বাস অবলম্বন করেছে সে নিছক আন্দাজ-অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে একটি ইমারত নির্মাণ করেছে। এ ইমারতের মূল ভিত্তি সন্দেহ-সংশয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ সন্দেহ তাকে নিয়ে গেছে ঘোরতর বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার দিকে। আল্লাহর অস্তিত্বে সে সন্দিহান হয়েছে। তাওহীদের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়েছে। আখেরাতের আগমনে সন্দেহ পোষণ করেছে। এমনকি এ সন্দেহকে সে নিশ্চিত বিশ্বাসের মতো মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নবীদের কোন কথা মানেনি এবং নিজের জীবনের সমগ্র কর্মকালকে একটি ভুল পথে ব্যয় করে দিয়েছে।

ফাতের

৩৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতের فاطر শব্দটিকে এ সূরার শিরোনাম করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'ফাতের' শব্দটি এসেছে। এর অন্য নাম الملائكه এবং এ শব্দটিও প্রথম আয়াতেই ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বক্তব্য প্রকাশের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সম্ভবত মক্কা মু'আয্‌যমার মধ্য যুগে সূরাটি নাযিল হয়। এ যুগেরও এমন সময় সূরাটি নাযিল হয় যখন ঘোরতর বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সব রকমের অপকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াতের মোকাবিলায় সে সময় মক্কাবাসীরা ও তাদের সরদার বৃন্দ যে নীতি অবলম্বন করেছিল, উপদেশের ভংগীতে সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক ও তিরস্কার করা এবং শিক্ষকের ভংগীতে উপদেশ দেয়াও। বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, হে মূর্খেরা! এ নবী যে পথের দিকে তোমাদেরকে আহবান করছেন তার মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিজেদের কল্যাণ। তার বিরুদ্ধে তোমাদের আক্রোশ, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য তোমাদের সমস্ত ফন্দি–ফিকির আসলে তাঁর বিরুদ্ধে নয় বরং তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছে। তাঁর কথা না মানলে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে, তাঁর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তোমাদের যা কিছু বলছেন সে সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখো তো, তার মধ্যে ভুল কোন্‌টা? তিনি শির্‌কের প্রতিবাদ করছেন। তোমরা নিজেরাই একবার ভালো করে চোখ মেলে তাকাও। দেখো, দুনিয়ায় শিরকের কি কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে? তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তোমরা নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা–ভাবনা করে দেখো, সত্যিই কি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া আর এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব আছে যে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী? তিনি তোমাদেরকে বলছেন, এ দুনিয়ায় তোমরা দায়িত্বহীন নও বরং তোমাদের নিজেদের আল্লাহর সামনে নিজেদের কাজের হিসেব দিতে হবে এবং এ দুনিয়ার জীবনের পরে আর

একটি জীবন আছে যেখানে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, এ সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ ও বিস্ময় কতটা ভিত্তিহীন। তোমাদের চোখ কি প্রতিদিন সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি প্রত্যেক্ষ করছে না? তাহলে যে আল্লাহ্ এক বিন্দু শুক্র থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা আবার অসম্ভব হবে কেন? ভালো ও মন্দের ফল সমান হওয়া উচিত নয়, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কি একথার সাক্ষ দেয় না? তাহলে তোমরাই বলো যুক্তিসংগত কথা কোন্‌টি—ভালো ও মন্দের পরিণাম সমান হোক? অর্থাৎ সবাই মাটিতে মিশে শেষ হয়ে যাক? অথবা ভালো লোক ভালো পরিণাম লাভ করুক এবং মন্দ লোক লাভ করুক তার মন্দ প্রতিফল? এখন তোমরা যদি এ পুরোপুরি যুক্তিসংগত ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কথাগুলো না মানো এবং মিথ্যা খোদাদের বন্দেগী পরিহার না করো উপরন্তু নিজেদেরকে অদায়িত্বশীল মনে করে লাগাম ছাড়া উটের মতো দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে এতে নবীর ক্ষতি কি? সর্বনাশ তো তোমাদেরই হবে। নবীর দায়িত্ব ছিল কেবলমাত্র বুঝানো এবং তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বক্তব্যের ধারাবাহিক বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি যখন উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করছেন তখন গোমরাহির ওপর অবিচল থাকতে যারা চাচ্ছে তাদের সঠিক পথে চলার আহবানে সাড়া না দেবার দায় আপনার ওপর বর্তাবে না। এই সাথে তাঁকে একথাও বুঝানো হয়েছে যে, যারা মানতে চায় না তাদের মনোভাব দেখে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের সঠিক পথে আনার চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করেও দেবেন না। এর পরিবর্তে যেসব লোক আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

ঈমান আনয়নকারীদেরকেও এ প্রসংগে বিরাট সুসংবাদ দান করা হয়েছে। এভাবে তাদের মনোবল বাড়বে এবং তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন করে সত্যের পথে অবিচল থাকবে।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা এবং ফেরেশ্‌তাদেরকে বাণীবাহক নিয়োগকারী[১] (এমন সব ফেরেশ্‌তা) যাদের দুই দুই তিন তিন ও চার চারটি ডানা আছে।[২] নিজের সৃষ্টির কাঠামোয় তিনি যেমনটি চান বৃদ্ধি করেন।[৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিমান। আল্লাহ যে রহমতের দরোজা মানুষের জন্য খুলে দেন তা রুদ্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে দেন তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই।[৪] তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।[৫]

১. এর অর্থ এও হতে পারে যে, ফেরেশ্‌তারা মহান আল্লাহ ও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মধ্যে বার্তা পৌছাবার কাজ করেন আবার এ অর্থও হতে পারে যে, সমগ্র বিশ্ব–জাহানে মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহর বিধান নিয়ে যাওয়া এবং সেগুলো প্রবর্তন করা এ ফেরেশ্‌তাদেরই কাজ। একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এ ফেরেশ্‌তাদেরকে মুশরিকরা দেব–দেবীতে পরিণত করেছিল অথচ এদের মর্যাদা এক ও লা–শরীক আল্লাহর একান্ত অনুগত খাদেমের চেয়ে মোটেই বেশী কিছু নয়। একজন বাদশাহর খাদেমরা যেমন তাঁর হুকুম তামিল করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে থাকে ঠিক তেমনি এ ফেরেশ্‌তারাও বিশ্ব–জাহানের প্রকৃত শাসনকর্তার হুকুম পালন করার জন্যও উড়ে চলতে থাকেন। এ খাদেমদের কোন ক্ষমতা নেই। সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে আসল শাসনকর্তার হাতে।

২. এ ফেরেশ্‌তাদের হাত ও ডানার অবস্থা ও ধরন জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এ অবস্থা ও ধরন বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ্‌ যখন এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা মানুষের ভাষায় পাখিদের হাত ও ডানার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখন

يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ڮ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

হে লোকেরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর যেসব অনুগ্রহ রয়েছে সেগুলো স্মরণ করো।[৬] আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয়?—তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা কোথা থেকে প্রতারিত হচ্ছো?[৭] এখন যদি (হে নবী!) এরা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে[৮] (তাহলে এটা কোন নতুন কথা নয়) তোমার পূর্বেও বহু রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপিত হয়েছে এবং সমস্ত বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।[৯]

অবশ্যই আমাদের ভাষার এ শব্দকেই আসল অবস্থা ও ধরন বর্ণনার নিকটতর বলে ধারণা করা যেতে পারে। দুই দুই, তিন তিন ও চার চার ডানার কথা বলা থেকে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন ফেরেশ্‌তাকে আল্লাহ বিভিন্ন পর্যায়ের শক্তি দান করেছেন এবং যাকে দিয়ে যেমন কাজ করতে চান তাকে ঠিক তেমনই দ্রুতগতি ও কর্মশক্তি দান করেছেন।

৩. এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাদের ডানার সংখ্যা চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং কোন কোন ফেরেশতাকে আল্লাহ এর চেয়েও বেশী ডানা দিয়েছেন। হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জিব্রীল আলাইহিস সালামকে এমন অবস্থায় দেখেন যখন তাঁর ডানার সংখ্যা ছিল ছ'শো। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী) হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) দু'বার জিব্রীলকে তাঁর আসল চেহারায় দেখেন। তখন তাঁর ছ'শো ডানা ছিল এবং তিনি সারা আকাশে ছেয়ে ছিলেন। (তিরমিযী)

৪. মুশরিকরা যে মনে করে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেউ তাদের রিযিকদাতা, কেউ সন্তানদাতা এবং কেউ রোগ নিরাময়কারী, তাদের এ ভুল ধারণা দূর করাও এর উদ্দেশ্য। শিরকের এ সমস্ত ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং নির্ভেজাল সত্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, বান্দাদের কাছে যে ধরনের রহমতই আসে নিছক মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর অনুগ্রহেই আসে। অন্য কারো এ রহমত দান করার ক্ষমতাও নেই এবং একে রোধ করার শক্তিও কারো নেই। এ বিষয়টি কুরআন মজীদ ও হাদীসের বহু স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে মানুষ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াবার এবং সবার কাছে হাত পাতার গ্লানি থেকে রেহাই পাবে। এই সংগে সে এ বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নেবে যে, তার ভাগ্য ভাঙা গড়া এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ারে নেই।

৫. পরাক্রমশালী অর্থাৎ সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পথে কেউ বাধা দিতে পারে না। আবার এই সংগে

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

হে লোকেরা! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবেই সত্য,[১০] কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে[১১] এবং সেই বড় প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে।[১২] আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রুই মনে করো। সে তো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এ জন্য ডাকছে যাতে তারা দোজখীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। যারা কুফরী করবে[১৩] তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও বড় পুরস্কার।[১৪]

তিনি জ্ঞানীও। যে ফায়সালাই তিনি করেন পুরোপুরি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই করেন। কাউকে দিলে সেটিই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন এবং কাউকে না দিলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন না।

৬. অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম হয়ো না। তোমরা যা কিছু লাভ করেছো তা আল্লাহরই দেয়া, এ সত্যটি ভুলে যেয়ো না। অন্য কথায় এ বাক্যটি এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, যে ব্যক্তিই আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করে অথবা কোন নিয়ামতকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার দান মনে করে কিংবা কোন নিয়ামত লাভ করার জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অথবা কোন নিয়ামত চাওয়ার জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে দোয়া করে সে বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৭. প্রথম বাক্যাংশ ও দ্বিতীয় বাক্যাংশের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফাঁক রয়েছে। কথার স্থান ও কাল নিজেই এ ফাঁক ভরে দিচ্ছে। একথা অনুধাবন করার জন্য কল্পনার চোখের সামনে একটি চিত্র মেলে ধরুন। অর্থাৎ মুশরিকদের সামনে বক্তৃতা চলছে। বক্তা শ্রোতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে এবং পৃথিবী ও আকাশ থেকে তোমাদের জীবিকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে?

এ প্রশ্ন করে বক্তা কয়েক মুহূর্ত জবাবের অপেক্ষা করেন। কিন্তু দেখেন সমাবেশের সমগ্র জনতা নিরব। কেউ বলে না, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জীবিকাদানকারী ও স্রষ্টাও আছে। এ থেকে আপনা আপনিই এ ফল প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা ও রিযিকদাতা নেই, শ্রোতাগণও একথা পুরোপুরি স্বীকার করে। এরপরই বক্তা বলেন, তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ মাবুদও হতে পারে না। তোমরা কেমন করে এ প্রতারণার শিকার হলে যে, স্রষ্টা ও রিযিকদাতা হবেন তো একমাত্র আল্লাহ কিন্তু মাবুদ হবেন তিনি ছাড়া অন্য কেউ?

৮. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাত লাভের অধিকারী নেই, তোমার একথা মানে না এবং তুমি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করছো, এ অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে আনে।

৯. অর্থাৎ ফায়সালা লোকদের হাতে নেই। তারা যাকে মিথ্যুক বলবে সে যথার্থই মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে না। ফায়সালা তো রয়েছে আল্লাহরই হাতে। মিথ্যুক কে ছিল তা তিনি শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দেবেন এবং প্রকৃতই যে মিথ্যুক তার পরিণতিও দেখিয়ে দেবেন।

১০. প্রতিশ্রুতি বলতে আখেরাতের প্রতিশ্রুতি বুঝানো হয়েছে যেদিকে ওপরের এ বাক্যে ইংগিত করে বলা হয়েছিল যে, সমস্ত বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হবে।

১১. অর্থাৎ এ দুনিয়াই সবকিছু এবং এরপর আর কোন আখেরাত নেই যেখানে কৃতকর্মের হিসেব নেয়া হবে, এ প্রতারণা জালে আবদ্ধ না করে। অথবা এভাবে প্রতারিত না করে যে, যদি কোন আখেরাত থেকেও থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় আরাম আয়েশে জীবন যাপন করছে সে সেখানেও আরাম আয়েশ করবে।

১২. "বড় প্রতারক" এখানে হচ্ছে শয়তান যেমন সামনের বাক্য বলছে। আর "আল্লাহর ব্যাপারে" ধোঁকা দেয়ার মানে হচ্ছে, শয়তান লোকদেরকে একথা বুঝায় যে, আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই এবং কিছু লোককে এ বিভ্রান্তির শিকার করে যে, আল্লাহ একবার দুনিয়াটা চালিয়ে দিয়ে তারপর বসে আরাম করছেন, এখন তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্ব–জাহানের সাথে কার্যত তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আবার কিছু লোককে সে এভাবে ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহ অবশ্যই এ বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি মানুষকে পথ দেখাবার কোন দায়িত্ব নেননি। কাজেই এ অহী ও রিসালাত নিছক একটি ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কিছু লোককে এ মিথ্যা আশ্বাসও দিয়ে চলছে যে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান, তোমরা যতই গোনাহ কর না কেন তিনি সব মাফ করে দেবেন এবং তাঁর এমন কিছু পিয়ারা বান্দা আছে যাদেরকে আঁকড়ে ধরলেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে।

১৩. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের এ দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করবে।

১৪. অর্থাৎ তাদের ভুল–ভ্রান্তি ও অপরাধ মাফ করে দেবেন এবং তারা যেসব সৎকাজ করবে সেগুলোর কেবল সমান সমান প্রতিদান দেবেন না বরং বড় ও বিপুল প্রতিদান দেবেন।

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٨﴾ وَاللّٰهُ الَّذِيْ أَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ﴿٩﴾

২ রুকূ'

(এমন[১৫] ব্যক্তির বিভ্রান্তির কোন শেষ আছে কি) যার জন্য তার খারাপ কাজকে শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং সে তাকে ভালো মনে করছে?[১৬] আসলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। কাজেই (হে নবী!) অযথা ওদের জন্য দুঃখে ও শোকে তুমি প্রাণপাত করো না।[১৭] ওরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।[১৮] আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন তারপর তা মেঘমালা উঠায় এরপর আমি তাকে নিয়ে যাই একটি জনমানবহীন এলাকার দিকে এবং মৃত পতিত যমীনকে সঞ্জীবিত করে তুলি। মৃত মানুষদের বেঁচে ওঠাও তেমনি ধরনের হবে।[১৯]

১৫. ওপরের দু'টি প্যারাগ্রাফ সাধারণ জনগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল। এখন এ প্যারাগ্রাফ যেসব বিভ্রান্তির নায়করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল তাদের কথা বলা হচ্ছে।

১৬. অর্থাৎ এমন এক ধরনের বিভ্রান্ত ও দুষ্কৃতকারী লোক আছে যে খারাপ কাজ করে ঠিকই কিন্তু সে জানে এবং স্বীকার করে যে সে যা কিছু করছে খারাপই করছে। এ ধরনের লোককে বুঝালেও ঠিক হয়ে যেতে পারে এবং কখনো নিজের বিবেকের তাড়নায়ও সে সঠিক পথে চলে আসতে পারে। কারণ তার শুধুমাত্র অভ্যাসই বিগড়েছে, মন–মানসিকতা বিগড়ে যায়নি। কিন্তু আর এক ধরনের দুষ্কৃতকারী আছে, যার মন–মানসিকতাই বিগড়ে গেছে। তার ভালো–মন্দের পার্থক্যবোধই খতম হয়ে গেছে। গোনাহের জীবন তার কাছে প্রিয় ও গৌরবময়। সৎকাজকে সে ঘৃণা করে এবং অসৎকাজকে যথার্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতি মনে করে। সৎবৃত্তি ও তাকওয়াকে সে প্রাচীনত্ব এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করা ও অশ্লীল কাজ করাকে প্রগতিশীলতা মনে করে। তার দৃষ্টিতে হিদায়াত গোমরাহীতে এবং গোমরাহী হিদায়াতে পরিণত হয়। এ ধরনের লোকের ওপর কোন উপদেশ কার্যকর হয় না। সে নিজের নির্বুদ্ধিতার ওপর নিজেই সতর্ক হয় না এবং কেউ তাকে বোঝালেও বোঝে না। এ ধরনের লোকের পেছনে লেগে থাকা অর্থহীন। তাকে সৎপথে আনার চিন্তায় প্রাণপাত না করে সত্যের আহবায়ককে এমনসব লোকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া

প্রয়োজন যাদের বিবেক এখনো বেঁচে আছে এবং যারা সত্যের আহবানের জন্য নিজেদের মনের দুয়ার বন্ধ করে দেয়নি।

১৭. আগের বাক্য এবং এ বাক্যের মাঝখানে "আল্লাহ যাকে চান গোমরাহীতে লিপ্ত করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখান"— একথা বলা পরিষ্কারভাবে এ অর্থই প্রকাশ করছে যে, যারা এতদূর মানবিক বিকৃতির শিকার হয় আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন এবং পথহারা হয়ে এমন সব পথে ঘুরে বেড়াবার জন্য তাদেরকে ছেড়ে দেন যেসব ভুল পথে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তারা নিজেরাই জিদ ধরে। এ সত্যটি বুঝিয়ে দেবার পর মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, এ ধরনের লোকদেরকে সঠিক পথে আনার সামর্থ তোমার নেই কাজেই তাদের ব্যাপারে সবর করো এবং আল্লাহ যেমন তাদের পরোয়া করছেন না তেমনি তোমরাও তাদের অবস্থা দেখে দুঃখিত ও শোকাভিভূত হয়ো না।

এ ক্ষেত্রে দু'টি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। এক, এখানে যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা সাধারণ লোক ছিল না। তারা ছিল মক্কা মু'আয্যমার সরদার। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সব রকমের মিথ্যা প্রতারণা ও ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিয়ে চলছিল। তারা আসলে নবী করীম (সা) সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা রাখতো না। তিনি কিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন এবং তাঁর মোকাবিলায় তারা নিজেরা কোন্ ধরনের মূর্খতা ও নৈতিক দুষ্কৃতির প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে তা তারা ভালোভাবে জানতো। এসব কিছু জানার ও বুঝার পর ঠাণ্ডা মাথায় তাদের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা চলতে দেয়া যাবে না। এ উদ্দেশ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অস্ত্র এবং সবচেয়ে হীন হাতিয়ার ব্যবহার করতে তারা একটুও কুণ্ঠিত ছিল না। এখন একথা সুস্পষ্ট, যারা জেনে বুঝে এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে প্রতিদিন একটি নতুন মিথ্যা রচনা করে এবং কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তা ছড়িয়ে বেড়ায় তারা সারা দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে কিন্তু নিজেকে তো তারা মিথ্যুক বলে জানে এবং তাদের নিজেদের কাছে একথা গোপন থাকে না যে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে তারা একটি অপবাদ দিয়েছে সে তা থেকে মুক্ত। তারপর যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ মিথ্যা হাতিয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে সে যদি এর জবাবে কখনো সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে সরে গিয়ে কোন কথা না বলে তাহলে এ জালেমদের কাছেও একথা কখনো গোপন থাকতে পারে না যে, তাদের মোকাবিলায় যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন সত্যবাদী ও নিখাদ পুরুষ। এরপরও নিজেদের কৃতকর্মের জন্য যারা এতটুকু লজ্জিত হয় না এবং অনবরত মিথ্যার মাধ্যমে সত্যের মোকাবিলা করে যেতে থাকে, তাদের এ নীতি নিজেই একথার সাক্ষ বহন করে যে, আল্লাহর লানত তাদের ওপর পড়েছে এবং ভালোমন্দের কোন পার্থক্যবোধ তাদের মধ্যে নেই।

দ্বিতীয় যে কথাটি এ প্রসংগে বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, নিছক স্বীয় রসূল পাককে কাফেরদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করানোই যদি আল্লাহর লক্ষ্য হতো, তাহলে তিনি গোপনে কেবলমাত্র তাঁকেই একথা বুঝাতে পারতেন। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে সুস্পষ্ট অহীর মাধ্যমে তার উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। কুরআন মজীদে একথা বর্ণনা করবার এবং সারা দুনিয়ার মানুষকে তা শুনিয়ে দেবার উদ্দেশ্যই ছিল আসলে সাধারণ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾

যে সম্মান চায় তার জানা উচিত সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহরই।[২০] তাঁর কাছে শুধুমাত্র পবিত্র কথাই ওপরের দিকে আরোহণ করে এবং সৎকাজ তাকে ওপরে ওঠায়।[২১] আর যারা অনর্থক চালবাজী করে[২২] তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং তাদের চালবাজী নিজেই ধ্বংস হবে।

মানুষকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, যেসব নেতার পেছনে তোমরা চোখ বন্ধ করে ছুটে চলছো তারা কতখানি বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোক এবং তাদের বেহুদা কাজকর্ম কেমন চিৎকার করে করে বলছে যে, তাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়েছে।

১৮. আলোচ্য বাক্যটির মধ্যে এ স্বতস্ফূর্ত হুমকি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, এমন একটি সময় আসবে যখন আল্লাহ তাদেরকে এসব কৃতকর্মের শাস্তি দেবেন। কোন শাসক যখন কোন অপরাধী সম্পর্কে বলেন, তার কাজকর্মের আমি সব খবর রাখি তখন তার অর্থ কেবল এতটুকুই হয় না যে, শাসক তার কাজকর্ম সব জানেন বরং তার মধ্যে এ সতর্কবাণীও নিহিত থাকে যে, আমি তাকে শাস্তি দেবোই।

১৯. অর্থাৎ এ মূর্খের দল আখেরাতকে অসম্ভব মনে করছে। তাই তারা নিজস্বভাবে এ চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছে যে, দুনিয়ায় তারা যাই কিছু করতে থাকুক না কেন, তাদের জবাবদিহি করার জন্য আল্লাহর সামনে হাজির হবার সময়টি কখনো আসবে না। কিন্তু তারা যার মধ্যে নিমগ্ন আছে সেটি নিছক একটি খামখেয়ালি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিয়ামতের দিন সামনের পেছনের সমস্ত মরা মানুষ মহান আল্লাহর একটিমাত্র ইশারায় সহসা ঠিক তেমনিভাবে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন একবার বৃষ্টি হবার পর শুকনো জমি অকস্মাত সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘকালের মৃত শিকড়গুলো সবুজ চারাগাছে রূপান্তরিত হয়ে মাটির বুক থেকে মাথা উঁচু করতে থাকে।

২০. মনে রাখতে হবে, কুরাইশ সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় যা কিছু করছিল সবই ছিল তাদের নিজেদের ইজ্জত ও মর্যাদার খাতিরে। তাদের ধারণা ছিল, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা গৃহীত হয়ে যায় তাহলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব খতম হয়ে যাবে। আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে এবং তামাম আরব মুল্লুকে আমাদের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত আছে তা মাটিতে মিশে যাবে। এরি প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কুফরী করে তোমরা নিজেদের যে মর্যাদা তৈরি করে রেখেছো এ তো একটি মিথ্যা ও ঠুনকো মর্যাদা। মাটিতে মিশে যাওয়াই এর ভাগ্যের লিখন। আসল ও চিরস্থায়ী মর্যাদা, দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত যা

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾

আল্লাহ[২৩] তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে[২৪] এরপর তোমাদের জুটি বানিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোন নারী গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করলে কেবলমাত্র আল্লাহর জানা মতেই তা করে থাকে। কোন আয়ু লাভকারী আয়ু লাভ করলে এবং কারো আয়ু কিছু কম করা হলে তা অবশ্যই একটি কিতাবে লেখা থাকে।[২৫] আল্লাহর জন্য এসব একদম সহজ।[২৬]

কখনো হীনতা ও লাঞ্ছনার শিকার হতে পারে না, তা কেবলমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তুমি যদি তাঁর হয়ে যাও, তাহলে তাঁকে পেয়ে যাবে এবং যদি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

২১. এ হচ্ছে মর্যাদা লাভ করার আসল উপায়। আল্লাহর কাছে মিথ্যা, কলুষিত ও ক্ষতিকারক কথা কখনো উচ্চ মর্যাদা লাভ করে না। তাঁর কাছে একমাত্র এমন কথা উচ্চ মর্যাদা লাভ করে যা হয় সত্য, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, বাস্তব ভিত্তিক, যার মধ্যে সদিচ্ছা সহকারে একটি ন্যায়নিষ্ঠ আকীদা-বিশ্বাস ও একটি সঠিক চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। তারপর একটি পবিত্র কথাকে যে জিনিসটি উচ্চ মর্যাদার দিকে নিয়ে যায় সেটি হচ্ছে কথা অনুযায়ী কাজ। যেখানে কথা খুবই পবিত্র কিন্তু কাজ তার বিপরীত সেখানে কথার পবিত্রতা নিস্তেজ ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র মুখে কথার খই ফুটালে কোন কথা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয় না বরং এ জন্য সৎকাজের শক্তিমত্তার প্রয়োজন হয়।

এখানে একথাও অনুধাবন করতে হবে যে, কুরআন মজীদ ভালো কথা ও ভালো কাজকে পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য বিষয় হিসেবে পেশ করে। কোন কাজ নিছক তার বাহ্যিক আকৃতির দিক দিয়ে ভালো হতে পারে না যতক্ষণ না তার পেছনে থাকে ভালো আকীদা-বিশ্বাস। আর কোন ভালো আকীদা-বিশ্বাস এমন অবস্থায় মোটেই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না যতক্ষণ না মানুষের কাজ তার প্রতি সমর্থন যোগায় এবং তার সত্যতা প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি যদি মুখে বলতে থাকে, আমি এক ও লা-শরীক আল্লাহকে মাবুদ বলে মানি কিন্তু কার্যত সে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে, তাহলে এ কাজ তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি যদি মুখে মদ হারাম বলতে থাকে এবং কার্যত মদ পান করে চলে, তাহলে শুধুমাত্র তার কথা মানুষের দৃষ্টিতেও গৃহীত হতে পারে না, আর আল্লাহর কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২২. অর্থাৎ বাতিল ও ক্ষতিকর কথা নিয়ে এগিয়ে আসে তারপর শঠতা, প্রতারণা ও মনোমুগ্ধকর যুক্তির মাধ্যমে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করে এবং তার

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۖ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

পানির দু'টি উৎস সমান নয়।[২৭] একটি সুমিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী সুস্বাদু পানীয় এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত যা গলা ছিলে দেয়, কিন্তু উভয়টি থেকে তোমরা তরতাজা গোশ্‌ত লাভ করে থাকো,[২৮] পরিধান করার জন্য সৌন্দর্যের সরঞ্জাম বের করো[২৯] এবং এ পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার বুক চিরে ভেসে চলছে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

মোকাবিলায় সত্য ও হক কথাকে ব্যর্থ করার জন্য সবচেয়ে খারাপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও পিছপা হয় না।

২৩. এখান থেকে আবার কথার মোড় সাধারণ মানুষের দিকে ঘুরে যাচ্ছে।

২৪. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি প্রথমে সরাসরি মাটি থেকে করা হয় তারপর তার বংশধারা চালানো হয় তার বীর্য থেকে।

২৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তিই দুনিয়ায় জন্মলাভ করে তার সম্পর্কে প্রথমেই লিখে দেয়া হয় সে দুনিয়ায় কত বছর বাঁচবে। কেউ দীর্ঘায়ু হলে তা হয় আল্লাহর হুকুমে এবং স্বল্পায়ু হলেও হয় আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী। কতিপয় অজ্ঞ ও মূর্খ লোক এর জবাবে এ যুক্তি পেশ করে থাকে যে, পূর্বে নবজাত শিশুদের মৃত্যুহার ছিল বেশী এবং বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এ মৃত্যুহার কমিয়ে দিয়েছে। পূর্বে লোকদের গড় আয়ু ছিল কম, বর্তমানে চিকিৎসা উপকরণ বৃদ্ধির ফলে আয়ু দীর্ঘায়িত হতে শুরু হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি কুরআন মজীদের এ বর্ণনার প্রতিবাদে কেবলমাত্র তখনই পেশ করা যেতে পারতো যখন কোন উপায়ে আমরা জানতে পারতাম, যেমন উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ অমুক ব্যক্তির আয়ু লিখেছিলেন দু'বছর এবং আমাদের চিকিৎসা উপকরণ তার মধ্যে একদিনের সময় বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এ ধরনের কোন জ্ঞান যদি কারো কাছে না থেকে থাকে, তাহলে সে কোন সংগত ভিত্তিতে কুরআনের এ উক্তির প্রতিবাদ করতে পারে না। সংখ্যাতত্ত্ব ও গণনার দিক দিয়ে শিশু মৃত্যুর হার এখন কমে গেছে অথবা আগের তুলনায় লোকেরা বেশী আয়ুর অধিকারী হচ্ছে, নিছক এই তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায় না যে, মানুষ এবার আল্লাহর ফায়সালা বদলে দেবার শক্তি অর্জন করেছে। আল্লাহ বিভিন্ন যুগে জন্মলাভকারী মানুষের আয়ু বিভিন্নভাবে নির্ধারণ করেছেন এতে অযৌক্তিক কি আছে? এবং এটিও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর ফায়সালা যে, অমুক যুগে মানুষকে অমুক রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা দান করা হবে এবং অমুক যুগে মানুষকে জীবনী শক্তি বৃদ্ধির অমুক উপায় দান করা হবে।

يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ
لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন।[৩০] চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অনুগত করে রেখেছেন।[৩১] এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহই (এ সমস্তই যাঁর কাজ) তোমাদের রব, রাজত্ব তাঁরই। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকছো তারা তো একটি শুকনো ভূমির[৩২] অধিকারীও নয়। তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনতে পারে না এবং শুনে নিলেও তোমাদের কোন জবাব দিতে পারে না।[৩৩] এবং কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শির্ক অস্বীকার করবে।[৩৪] প্রকৃত অবস্থার এমন সঠিক খবর একজন সর্বজ্ঞ ছাড়া কেউ তোমাদের দিতে পারে না।[৩৫]

২৬. অর্থাৎ এত অসংখ্য সৃষ্টির ব্যাপারে এত বিস্তারিত জ্ঞান থাকা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এত বিস্তারিত বিধান দেয়া ও ফায়সালা করা আল্লাহর জন্য মোটেই কোন কঠিন কাজ নয়।

২৭. অর্থাৎ পানির একটি উৎস যা সমুদ্রগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং পানির দ্বিতীয় উৎসটি গড়ে উঠেছে নদী, ঝরণা, হ্রদ ইত্যাদির সমন্বয়ে।

২৮. অর্থাৎ জলজ প্রাণীর গোশ্‌ত।

২৯. অর্থাৎ মুক্তা, প্রবাল এবং কোন কোন নদী–সাগর থেকে হীরা ও সোনা।

৩০. অর্থাৎ দিনের আলো ধীরে ধীরে নিভে যেতে থাকে এবং রাতের আঁধার বেড়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি তাকে ঢেকে ফেলে। এভাবে রাতের শেষ দিকে দিগন্তে হাল্‌কা আলোর রেখা জেগে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে তা অগ্রসর হতে হতে আলোকোজ্জ্বল দিনে পরিণত হয়।

৩১. অর্থাৎ একটি নিয়ম ও বিধানের অধীন করে রেখেছেন।

৩২. মূলে "কিত্‌মীর" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিত্‌মীর বলা হয় খেজুরের আঁটির গায়ে জড়ানো পাতলা ঝিল্লি বা আবরণকে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۱۵﴾
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۶﴾ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۱۷﴾
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ
مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۗ وَاِلَى
اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾

৩ রুকূ’

হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী[৩৬] এবং আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।[৩৭] তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে কোন নতুন সৃষ্টি তোমাদের জায়গায় আনবেন। এমনটি করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।[৩৮] কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা উঠাবে না।[৩৯] আর যদি কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি নিজের বোঝা উঠাবার জন্য ডাকে, তাহলে তার বোঝার সামান্য একটি অংশ উঠাবার জন্যও কেউ আসবে না, সে তার নিকটতম আত্মীয় স্বজন হলেও।[৪০] (হে নবী ঃ) তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে।[৪১] আর যে ব্যক্তিই পবিত্রতা অবলম্বন করে সে নিজেরই ভালোর জন্য করে এবং ফিরে আসতে হবে সবাইকে আল্লাহরই দিকে।

মুশরিকদের মাবুদ ও উপাস্যরা কোন তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসেরও মালিক নয়। তাই শাব্দিক তরজমা বাদ দিয়ে আমি এখানে ভাব–তরজমা করেছি।

৩৩. এর অর্থ এ নয় যে, তারা তোমাদের দোয়ার জবাবে তোমাদের দোয়া কবুল করা হয়েছে বা হয়নি একথা চিৎকার করে বলতে পারে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা তোমাদের আবেদনের ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ নিতে পারে না। কোন ব্যক্তি নিজের আবেদন যদি এমন কোন ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেয় যে শাসনকর্তা নয়, তাহলে তার আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ তা যার কাছে পাঠানো হয়েছে তার হাতে আদতে কোন ক্ষমতাই নেই। প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করার কোন ইখতিয়ার তার নেই তবে এই একই আবেদন আবার যদি যথার্থ শাসনকর্তার কাছে পাঠানো হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে কোন না কোন পদক্ষেপ গৃহীত হবেই। তা গৃহীতও হতে পারে আবার প্রত্যাখ্যাতও।

৩৪. অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে, আমরা কখনো এদেরকে বলিনি, আমরা আল্লাহর শরীক এবং তোমরা আমাদের ইবাদাত করো। বরং আমরা এও জানতাম না যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে শরীক করছে এবং আমাদের কাছে প্রার্থনা করছে। এদের কোন প্রার্থনা আমাদের কাছে আসেনি এবং এদের কোন নজরানা ও উৎসর্গ আমাদের হস্তগত হয়নি।

৩৫. সর্বজ্ঞ বলে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তিতো বড় জোর বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি–প্রমাণ পেশ করে শিরক খণ্ডন ও মুশরিকদের মাবুদদের শক্তিহীনতা বর্ণনা করবে। কিন্তু আমি সরাসরি প্রকৃত অবস্থা জানি। আমি নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাদের জানাচ্ছি, লোকেরা যাদেরকেই আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন করে রেখেছে তারা সবাই ক্ষমতাহীন। তাদের কাছে এমন কোন শক্তি নেই যার মাধ্যমে তারা কারো কোন কাজ সফল বা ব্যর্থ করে দিতে পারে। আমি সরাসরি জানি, কিয়ামতের দিন মুশরিকদের এসব মাবুদরা নিজেরাই তাদের শিরকের প্রতিবাদ করবে।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী, তোমরা তাঁকে আল্লাহ বলে মেনে না নিলে তাঁর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চলবে না এবং তোমরা তাঁর ইবাদাত ও বন্দেগী না করলে তাঁর কোন ক্ষতি হয়ে যাবে, এ ভুল ধারণা পোষণ করো না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি যদি তোমাদের জীবিত না রাখেন এবং যেসব উপকরণের সহায়তায় তোমরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকো এবং কাজ করতে পারো সেগুলো তোমাদের জন্য সরবরাহ না করেন, তাহলে তোমাদের জীবন এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারে না। কাজেই তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাতের পথ অবলম্বন করার জন্য তোমাদেরকে যে তাকীদ দেয়া হয় তা এ জন্য নয় যে, আল্লাহর এর প্রয়োজন আছে বরং এ জন্য যে, এরি ওপর নির্ভর করে তোমাদের দুনিয়ার ও আখেরাতের সাফল্য। এমনটি না করলে তোমরা নিজেদেরই সবকিছুর সর্বনাশ করে ফেলবে, আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৩৭. মূলে বলা হয়েছে "গনী" ও হামীদ" "গনী" মানে হচ্ছে, তিনি সবকিছুর মালিক, প্রত্যেকটি জিনিসের অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। আর "হামীদ" মানে হচ্ছে, তিনি নিজে নিজেই প্রশংসিত, কেউ তাঁর প্রশংসা (শোকর ও প্রশংসা) করুক বা না করুক প্রশংসা লাভ করার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। এ দু'টি গুণকে একসাথে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, নিছক 'গনী' তো এমন ব্যক্তিও হতে পারে যে নিজের ধনাঢ্যতা দ্বারা কারো সাহায্য বা উপকার করে না। এ অবস্থায় সে গনী অবশ্যই হবে কিন্তু হামীদ বা প্রশংসিত হবে না। 'হামীদ' সে হতে পারে এমন অবস্থায় যখন সে কারো সাহায্যে নিজে লাভবান হবে না কিন্তু নিজের ধন–সম্পদ থেকে অন্যদেরকে সব ধরনের সহায়তা দান করবে। আল্লাহ যেহেতু এ দু'টি গুনের পূর্ণ আধার তাই বলা হয়েছে, তিনি নিছক 'গনী' নন বরং এমন 'গনী' যিনি সব রকমের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী। কারণ তিনি তোমাদের এবং বিশ্ব–জাহানের যাবতীয় জড় ও জীবের প্রয়োজন পূর্ণ করেন।

৩৮. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের শক্তিতে এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছো না। তোমাদেরকে এখান থেকে বিদায় দেবার এবং তার জায়গায় অন্য কোন জাতিকে এনে

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾
وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, না অন্ধকার ও আলো সমান পর্যায়ভূক্ত, না শীতল ছায়া ও রোদের তাপ একই পর্যায়ের এবং না জীবিত ও মৃতরা সমান।[৪২] *আল্লাহ যাকে চান শুনান কিন্তু (হে নবী!) তুমি তাদেরকে শুনাতে পারো না যারা কবরে শায়িত রয়েছে।*[৪৩]

বসাবার জন্য তাঁর একটি ইশারাই যথেষ্ট। কাজেই নিজের মর্যাদা অনুধাবন করো এবং এমন নীতি অবলম্বন করো না যার ফলে শেষ পর্যন্ত জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন কারো ধ্বংসের ফায়সালা এসে যায় তখন সমগ্র বিশ্ব–জাহানে এমন কোন শক্তি নেই যে তাঁর হাত টেনে ধরতে পারে এবং এ ফায়সালা কার্যকর হবার পথ রোধ করতে সক্ষম হয়।

৩৯. "বোঝা" মানে কৃতকর্মের দায়–দায়িত্বের বোঝা। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই তার কাজের জন্য দায়ী এবং প্রত্যেকের ওপর কেবলমাত্র তার নিজের কাজের দায়–দায়িত্ব আরোপিত হয়। এক ব্যক্তির কাজের দায়–দায়িত্বের বোঝা আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন ব্যক্তি অন্যের দায়––দায়িত্বের বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নেবে এবং তাকে বাঁচাবার জন্য তার অপরাধে নিজেকে পাকড়াও করাবে––এরও কোন সম্ভাবনা নেই। একথা এখানে বলার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কা মু'আযযমায় যারা ইসলাম গ্রহণ করছিল তাদেরকে তাদের মুশরিক আত্মীয় স্বজন ও গোত্রের লোকেরা বলছিল, আমাদের কথায় তোমরা এই নতুন ধর্ম ত্যাগ করো এবং নিজেদের বাপ–দাদার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যাও, এ জন্য পাপপুণ্যের বোঝা আমরা বহন করবো।

৪০. ওপরের বাক্যে আল্লাহর ন্যায়নীতির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি একজনের পাপে অন্যকে পাকড়াও করবেন না। বরং প্রত্যেককে তার নিজের পাপের জন্য দায়ী করবেন। আর এখানে এ বাক্যে বলা হয়েছে, আজ যারা বলছে, তোমরা আমাদের দায়িত্বে কুফরী ও গোনাহের কাজ করে যাও কিয়ামতের দিন তোমাদের গোনাহর বোঝা আমরা নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নেবো তারা আসলে নিছক একটি মিথ্যা ভরসা দিচ্ছে। যখন কিয়ামত আসবে এবং লোকেরা দেখে নেবে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তারা কোন্ ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে তখন প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাবার ফিকিরে লেগে যাবে। ভাই ভাইয়ের থেকে এবং পিতা পুত্রের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কেউ কারো সামান্যতম বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নিতে প্রস্তুত হবে না।

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।[৪৪] আমি তোমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে। আর এমন কোন সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যার মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি।[৪৫] এখন এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে তাহলে এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের কাছে এসেছিল তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি[৪৬] সহীফা ও দীপ্তোজ্জ্বল হিদায়াত দানকারী কিতাব[৪৭] নিয়ে। তারপর যারা মানেনি তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি এবং দেখে নাও আমার শাস্তি ছিল কেমন কঠোর।

৪১. অন্য কথায় হঠকারী ও গোঁয়ারদের ওপর তোমার সতর্কবাণী কার্যকর হতে পারে না। তুমি বুঝালে এমন সব লোক সত্য–সঠিক পথে আসতে পারে যাদের দিলে আল্লাহর ভয় আছে এবং যারা নিজের প্রকৃত মালিকের সামনে মাথা নোয়াতে প্রস্তুত।

৪২. এ উপমাগুলোতে মু'মিন ও কাফেরের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। এক ব্যক্তি প্রকৃত সত্য থেকে চোখ বন্ধ করে আছে। সে একবারও দেখছে না বিশ্ব–জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা এবং এমনকি তার নিজের অস্তিত্ব কোন্ সত্যের প্রতি ইংগিত করছে। অন্যদিকে আর এক ব্যক্তির চোখ খোলা আছে। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তার ভেতরের ও বাইরের প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর সামনে মানুষের জবাবদিহির ওপর সাক্ষ দিচ্ছে। একদিকে এক ব্যক্তি জাহেলী কল্পনা ও ভাববাদ এবং ধারণা, আন্দাজ–অনুমানের অন্ধকারে হাতড়ে মরছে এবং নবীর জ্বালানো প্রদীপের কাছাকাছি ঘেঁসতেও রাজি নয়। অন্যদিকে অপর ব্যক্তির চোখ একদম খোলা। নবীর জ্বালানো আলোর সামনে আসতেই তার কাছে একথা একেবারেই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুশরিক, কাফের ও নাস্তিক্যবাদীরা যেসব পথে চলছে সেগুলো ধ্বংসের দিকে চলে গেছে এবং সাফল্য ও মুক্তির পথ একমাত্র সেটিই যেটি আল্লাহ ও তাঁর রসূল দেখিয়েছেন। এখন দুনিয়ায় এদের দু'জনের নীতি এক হবে এবং দু'জনে এক সাথে একই পথে চলতে পারবে, এটা কেমন করে সম্ভব? দু'জনের পরিণতি এক হবে, দু'জনই মরে খতম হয়ে যাবে, একজন তার কুপথগামিতার শাস্তি পাবে না এবং অন্যজন সৎপথে চলার জন্য কোন পুরস্কার পাবে না, এটাই বা কেমন করে সম্ভব? "শীতল ছায়া ও রোদের তাপ সমান নয়"—এর মধ্যে এ পরিণতির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে যে, একজন আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভকারী এবং অন্যজন জাহান্নামের উত্তাপে ঝলসানো ব্যক্তি। তোমরা কোন্

উদ্ভট চিন্তায় মেতে আছো, এরা দু'জনা কি একই পরিণাম ভোগ করবে? শেষে মু'মিনকে জীবিতের সাথে এবং হঠকারী কাফেরদেরকে মৃতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিন হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার মধ্যে অনুভূতি, উপলব্ধি, বিবেচনা, জ্ঞান, বুঝ ও চেতনা আছে এবং তার বিবেক তাকে ভালো ও মন্দের মধ্যকার পার্থক্য থেকে সবসময় সজাগ করছে। এর বিপরীত যে ব্যক্তি কুফরীর অন্ধতায় পুরোপুরি ডুবে গেছে তার অবস্থা এমন অন্ধের চেয়েও খারাপ যে অন্ধকারে পথ হারিয়েছে। তার অবস্থা এমন মৃতের মতো যার মধ্যে কোন অনুভূতিই নেই।

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপার তো ভিন্ন। তিনি চাইলে পাথরকেও শ্রবণশক্তি দান করেন। কিন্তু যাদের বক্ষদেশে বিবেকের কবর রচিত হয়েছে তাদের হৃদয়ে নিজের কথা বদ্ধমূল করে দিতে পারা এবং যারা কথা শুনতেই চায় না তাদের বধির কর্ণকুহরে সত্যের ধ্বনি পৌঁছিয়ে দেয়ার সাধ্য রসূলের নেই। তিনি তো কেবলমাত্র তাদেরকেই শুনাতে পারেন যারা যুক্তিসংগত কথা শুনতে চায়।

৪৪. অর্থাৎ লোকদেরকে সতর্ক করে দেবার চেয়ে বেশী আর কোন দায়িত্ব তোমার নেই। এরপর যদি কেউ সচেতন না হয় এবং নিজের গোমরাহীর মধ্যে ছুটে চলতে থাকে তাহলে এর কোন দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর নেই। অন্ধদের দেখাবার এবং বধিরদের শুনাবার দায়িত্ব তোমার ওপর সোপর্দ করা হয়নি।

৪৫. একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, দুনিয়ায় এমন কোন জাতি ও সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যাকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য আল্লাহ কোন নবী পাঠাননি। সূরা রা'আদে বলা হয়েছে ঃ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (ايت : ٧)

সূরা হিজ্‌রে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ (ايت : ١٠)

সূরা নাহ্‌লে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً (ايت : ٣٦)

সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে ঃ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ (ايت : ٢٠٨)

কিন্তু এ প্রসংগে দু'টি কথা অনুধাবন করতে হবে। তাহলে আর ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকবে না। প্রথমত হচ্ছে, একজন নবীর প্রচারণা যতদূর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে ততদূর পর্যন্ত তিনিই যথেষ্ট। প্রত্যেকটি জনপদে ও প্রত্যেকটি জাতির মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে নবী পাঠানো মোটেই জরুরী নয়। দ্বিতীয়ত, একজন নবীর দাওয়াত ও হিদায়াতের প্রভাব এবং তাঁর নেতৃত্বের পদাংক যতদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত অন্য কোন নতুন নবীর প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক বংশ ও প্রত্যেক প্রজন্মের (Generation) জন্য আলাদা নবী পাঠানো অপরিহার্য নয়।

৪৬. অর্থাৎ এমন প্রমাণপত্র যা পরিষ্কারভাবে একথার সাক্ষ দিচ্ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর রসূল।

৪৭. সহীফা ও কিতাবের মধ্যে সম্ভবত একটি বড় পার্থক্য থেকে থাকবে। সেটি হচ্ছে এই যে, সহীফা প্রধানত ছিল উপদেশাবলী ও নৈতিক পথ নির্দেশনার সমষ্টি। অন্যদিকে কিতাবে বিধৃত থাকতো একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত ব্যবস্থা।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

৪ রুকূ'

তুমি কি দেখো না আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর তার মাধ্যমে আমি নানা ধরনের বিচিত্র বর্ণের ফল বের করে আনি? পাহাড়ের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র বর্ণের—সাদা, লাল ও নিকষকালো রেখা। আর এভাবে মানুষ, জীব–জানোয়ার ও গৃহপালিত জন্তুও বিভিন্ন বর্ণের রয়েছে।[৪৮] আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞান সম্পন্নরাই তাঁকে ভয় করে।[৪৯] নিসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল।[৫০]

৪৮. এ দ্বারা যে কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা এই আল্লাহর সৃষ্ট এ বিশ্ব–জাহানে কোথাও একঘেয়েমি ও বৈচিত্রহীনতা নেই। সর্বত্রই বৈচিত্র বৈচিত্র। একই মাটি ও একই পানি থেকে বিভিন্ন প্রকার গাছ উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছের দু'টি ফলেরও বর্ণ, দৈহিক কাঠামো ও স্বাদ এক নয়। একই পাহাড়ের দিকে তাকালে তার মধ্যে দেখা যাবে নানা রঙের বাহার। তার বিভিন্ন অংশের বস্তুগত গঠনপ্রণালীতে বিরাট পার্থক্য পাওয়া যাবে। মানুষ ও পশুদের মধ্যে একই মা–বাপের দু'টি সন্তানও একই রকম পাওয়া যাবে না। এ বিশ্ব–জাহানে যদি কেউ মেজাজ, প্রকৃতি ও মানসিকতার একাত্মতা সন্ধান করে এবং বিভিন্নতা, বিচিত্রতা ও বৈষম্য দেখে আতংকিত হয়ে পড়ে, যেদিকে ওপরের ১৯ থেকে ২২ আয়াতে ইশারা করা হয়েছে, তাহলে এটা হবে তার নিজের বোধশক্তি ও উপলব্ধির ক্রটি। এই বৈচিত্র ও বিরোধই জানিয়ে দিচ্ছে, এ বিশ্ব–জাহানকে কোন মহাপরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তা বহুবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং এর নির্মাতা একজন নজীরবিহীন স্রষ্টা ও তুলনাবিহীন নির্মাণ কৌশলী। তিনি একই জিনিসের কেবল একটিমাত্র নমুনা নিয়ে বসে পড়েননি। বরং তাঁর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একের পর এক এবং অসংখ্য ও সীমাহীন ডিজাইন রয়েছে। তারপর বিশেষ করে মানবিক প্রকৃতি ও বুদ্ধি বৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে যে কোন ব্যক্তি একথা বুঝতে পারে যে, এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় সৃষ্টি জ্ঞানের নিদর্শন। যদি জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট, প্রবৃত্তি, কামনা, আবেগ–অনুভূতি, ঝোঁকপ্রবণতা ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে এক করে দেয়া হতো এবং কোনপ্রকার বৈষম্য–বিভিন্নতার কোন অবকাশই না রাখা হতো, তাহলে দুনিয়ায় মানুষের

মতো একটি নতুন ধরনের সৃষ্টি তৈরি করাই হতো পুরোপুরি অর্থহীন। স্রষ্টা যখন এ পৃথিবীতে একটি দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করার ফায়সালা করেছেন তখন তার কাঠামোর মধ্যে সব রকমের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার অবকাশ রাখা ছিল সে ফায়সালার ধরনের অনিবার্য দাবী। মানুষ যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল নয় বরং একটা মহান বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, এ জিনিসটি এর সবচেয়ে বড় সাক্ষ প্রদান করে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই অনিবার্যভাবে তার পেছনে পাওয়া যাবে এক বিজ্ঞানময় সত্তার সক্রিয় সংযোগ। বিজ্ঞানী ছাড়া বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কেবলমাত্র একজন নির্বোধই কল্পনা করতে পারে।

৪৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে যতবেশী অজ্ঞ হবে সে তাঁর ব্যাপারে তত বেশী নির্ভীক হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর শক্তিমত্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানময়তা, ক্রোধ, পরাক্রম, সার্বভৌম কর্তৃত্ব–ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে যে ব্যক্তি যতবেশী জানবে সে ততবেশী তাঁর নাফরমানী করতে ভয় পাবে। কাজেই আসলে এ আয়াতে জ্ঞান অর্থ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক ইত্যাদি স্কুল–কলেজে পঠিত বিষয়ের জ্ঞান নয়। বরং এখানে জ্ঞান বলতে আল্লাহর গুণাবলীর জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এ জন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হবার প্রশ্ন নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলেও এ জ্ঞানের দৃষ্টিতে সে নিছক একজন মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলী জানে এবং নিজের অন্তরে তাঁর ভীতি পোষণ করে সে অশিক্ষিত হলেও জ্ঞানী। এ প্রসংগে একথাও জেনে রাখা উচিত যে, এ আয়াতে উল্লেখিত "উলামা" শব্দটির অর্থ এমন পারিভাষিক উলামাও নয় যারা কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ও ইল্মে কালামে জ্ঞান রাখার কারণে দীনী আলেম বলে পরিচিত। তারা ঠিক তখনই এ আয়াতটির প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত হবে যখন তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একথাই বলেছেন ঃ

ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية

"বিপুল সংখ্যক হাদীস জানা জ্ঞানের পরিচায়ক নয় বরং বেশী পরিমাণ আল্লাহভীতিই জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।"

হযরত হাসান বাসরীও একথাই বলেছেন ঃ

العالم من خشى الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه –

"আল্লাহকে না দেখে যে ভয় করে সেই হচ্ছে আলেম। আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন সেদিকেই আকৃষ্ট হয় এবং যে বিষয়ে আল্লাহ নারাজ সে ব্যাপারে সে কোন আগ্রহ পোষণ করে না।"

৫০. অর্থাৎ তিনি এমন পরাক্রমশালী যে, নাফরমানদের যখনই চান পাকড়াও করতে পারেন। তাঁর পাকড়াও মুক্ত হবার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু তাঁর ক্ষমাগুণের ফলেই জালেমরা অবকাশ পেয়ে চলছে।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, নিসন্দেহে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের প্রত্যাশী যাতে কোনক্রমেই ক্ষতি হবে না। (এ ব্যবসায়ে তাদের নিজেদের সবকিছু নিয়োগ করার কারণ হচ্ছে এই যে) যাতে তাদের প্রতিদান পুরোপুরি আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে দেন এবং নিজের অনুগ্রহ থেকে আরো বেশী করে তাদেরকে দান করবেন।[৫১] *নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।*[৫২] *(হে নবী!) আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠিয়েছি সেটিই সত্য, সত্যায়িত করে এসেছে তার পূর্বে আগত কিতাবগুলোকে।*[৫৩] *অবশ্যই আল্লাহ নিজের বান্দাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং সব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।*[৫৪]

৫১. ঈমানদারদের এ কাজকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। কারণ মানুষ ব্যবসায়ে নিজের অর্থ, শ্রম ও মেধা নিয়োগ করে কেবলমাত্র আসল ফেরত পাবার এবং শ্রমের পারিশ্রমিক লাভ করার জন্য নয় বরং বাড়তি কিছু মুনাফা অর্জন করার জন্য। অনুরূপভাবে একজন মু'মিনও আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর ইবাদাত–বন্দেগী এবং তাঁর দীনের জন্য সংগ্রাম–সাধনায় নিজের ধন, সময়, শ্রম ও যোগ্যতা নিয়োগ করে শুধুমাত্র এসবের পুরোপুরি প্রতিদান লাভ করার জন্য নয় বরং এই সংগে আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে বাড়তি অনেক কিছু দান করবেন এই আশায়। কিন্তু উভয় ব্যবসায়ের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব ব্যবসায়ে নিছক মুনাফালাভেরই আশা থাকে না, লোকসান এবং দেউলিয়া হয়ে যাবার আশংকাও থাকে। কিন্তু একজন আন্তরিকতা সম্পন্ন বান্দা আল্লাহর সাথে যে ব্যবসায় করে তাতে লোকসান ও ক্ষতির কোন আশংকাই নেই।

৫২. অর্থাৎ নিজের আন্তরিকতা সম্পন্ন মু'মিনদের সাথে আল্লাহ এমন সংকীর্ণমনা প্রভুর মতো ব্যবহার করেন না, যে কথায় কথায় পাকড়াও করে এবং সামান্য একটি ভুলের দরুন নিজের কর্মচারীর সমস্ত সেবা ও বিশ্বস্ততা অস্বীকার করে। তিনি মহানুভব দানশীল প্রভু। তাঁর বিশ্বস্ত বান্দার ভুল–ভ্রান্তি তিনি উপেক্ষা করে যান এবং তার পক্ষে যা কিছু সেবা করা সম্ভব হয়েছে তাকে যথার্থ মূল্য দান করেন।

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ؕ﴿۳۲﴾

তারপর আমি এমন লোকদেরকে এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি যাদেরকে আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি।[৫৫] এখন তাদের মধ্য থেকে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর হুকুমে সৎকাজে অগ্রবর্তী, এটিই অনেক বড় অনুগ্রহ।[৫৬]

৫৩. এর অর্থ হচ্ছে, পূর্বে আগত নবীগণ যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি তার বিরোধী কোন নতুন কথা বলছেন না। বরং সকল নবী চিরকাল যে আদি ও চিরন্তন সত্য পেশ করে গেছেন তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করছেন।

৫৪. বান্দার কল্যাণ কোন্ জিনিসের মধ্যে রয়েছে, তার নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের উপযোগী নীতি কি এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ নীতি–নিয়ম কি কি—এ সত্যগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই হচ্ছে এখানে আল্লাহর এ গুণাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য। এ বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। কারণ বান্দার প্রকৃতি ও চাহিদা একমাত্র তিনিই জানেন এবং তার প্রকৃত প্রয়োজন ও কল্যাণের প্রতি একমাত্র তিনিই দৃষ্টি রাখেন। বান্দা নিজেকে তত বেশী জানে না যত বেশী তার স্রষ্টা তাকে জানেন। তাই সত্য সেটিই এবং একমাত্র সেটিই হতে পারে যা তিনি অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

৫৫. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে। সমগ্র মানবজাতি থেকে ছাঁটাই বাছাই করে তাদেরকে বের করা হয়েছে। এভাবে তারা হবে আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এ কিতাব নিয়ে তারা অগ্রসর হবে। যদিও কিতাব পেশ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির সামনে কিন্তু যারা এগিয়ে এসে তা গ্রহণ করে নিয়েছে তাদেরকে এ মর্যাদা ও গৌরবের জন্য নির্বাচিত করে নেয়া হয়েছে যে, তারাই হবে কুরআনের ন্যায় মহিমান্বিত কিতাবের ওয়ারিস এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় মহান রসূলের শিক্ষা ও হিদায়াতের বিশ্বস্ত সংরক্ষক।

৫৬. অর্থাৎ এ মুসলমানরা সবাই একরকম নয়। বরং এরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে ঃ

এক ঃ নিজেদের প্রতি জুলুমকারী। এরা হচ্ছে এমনসব লোক যারা আন্তরিকতা সহকারে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রসূল বলে মানে কিন্তু কার্যত আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণের হক আদায় করে না। এরা মু'মিন কিন্তু গোনাহগার। অপরাধী কিন্তু বিদ্রোহী নয়। দুর্বল

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّلُـؤۡلُـؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمۡ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ ﴿۳۳﴾ وَقَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِىۡۤ اَذۡهَبَ عَنَّا الۡحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَكُوۡرُۨ ﴿۳۴﴾ الَّذِىۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَةِ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيۡهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيۡهَا لُـغُوۡبٌ ﴿۳۵﴾

চিরস্থায়ী জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে।[৫৭] সেখানে তাদেরকে সোনার কংকন ও মুক্তা দিয়ে সাজানো হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের এবং তারা বলবে : আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ মোচন করেছেন।[৫৮] অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল ও গুণের সমাদরকারী,[৫৯] যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাসস্থল দিয়েছেন।[৬০] এখন এখানে আমাদের না কোন কষ্ট হয় এবং না আসে কোন ক্লান্তি।[৬১]

ঈমানদার, তবে মুনাফিক এবং চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে কাফের নয়। তাই এদেরকে আত্মনিপীড়ক হওয়া সত্ত্বেও কিতাবের ওয়ারিসদের অন্তরভুক্ত এবং আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। নয়তো একথা সুস্পষ্ট, বিদ্রোহী, মুনাফিক এবং চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে কাফেরদের প্রতি এ গুণাবলী আরোপিত হতে পারে না। তিন শ্রেণীর মধ্য থেকে এ শ্রেণীর ঈমানদারদের কথা সবার আগে বলার কারণ হচ্ছে এই যে, উম্মাতের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশী।

দুই : মাঝামাঝি অবস্থানকারী। এরা হচ্ছে এমন লোক যারা এ উত্তরাধিকারের হক কমবেশী আদায় করে কিন্তু পুরোপুরি করে না। হুকুম পালন করে এবং অমান্যও করে। নিজেদের প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি লাগামহীন করে ছেড়ে দেয়নি বরং তাকে আল্লাহর অনুগত করার জন্য নিজেদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু কখনো তার বাগডোর ঢিলে করে দেয় এবং গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এভাবে এদের জীবনে ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের কাজের সমাবেশ ঘটে। এরা সংখ্যায় প্রথম দলের চেয়ে কম এবং তৃতীয় দলের চেয়ে বেশী হয়। তাই এদেরকে দু' নম্বরে রাখা হয়েছে।

তিন : ভালো কাজে যারা অগ্রবর্তী। এরা হয় কিতাবের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রথম সারির লোক। এরাই আসলে এ উত্তরাধিকারের হক আদায়কারী। কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রেও এরা অগ্রগামী। আল্লাহর পয়গাম তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার ক্ষেত্রেও এরাই এগিয়ে থাকে। সত্যদীনের জন্য ত্যাগ স্বীকারেও এরাই এগিয়ে যায়। তাছাড়া সত্য, ন্যায়, সুকৃতি ও কল্যাণের যে কোন কাজেও এরাই হয় অগ্রবর্তী। এরা জেনে বুঝে গোনাহ করে না। আর অজান্তে কোন গোনাহর কাজ অনুষ্ঠিত হলেও সে সম্পর্কে জানার সাথে সাথেই এদের মাথা লজ্জায় নত হয়ে যায়। প্রথম দু'টি দলের তুলনায়

উম্মাতের মধ্যে এদের সংখ্যা কম। তাই এদের কথা সবার শেষে বলা হয়েছে, যদিও উত্তরাধিকারের হক আদায় করার ক্ষেত্রে এরাই অগ্রগামী।

"এটিই অনেক বড় অনুগ্রহ" বাক্যটির সম্পর্ক যদি নিকটতম বাক্যের সাথে ধরে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, ভালো কাজে অগ্রগামী হওয়াই হচ্ছে বড় অনুগ্রহ এবং যারা এমনটি করে মুসলিম উম্মাতের মধ্যে তারাই সবার সেরা। আর এ বাক্যটির সম্পর্ক পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে করা হলে এর অর্থ হবে, আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়া এবং এ উত্তরাধিকারের জন্য নির্বাচিত হওয়াই বড় অনুগ্রহ এবং আল্লাহর সকল বান্দাদের মধ্যে সেই বান্দাই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনে এ নির্বাচনে সফলকাম হয়েছে।

৫৭. মুফাস্‌সিরগণের একটি দলের মতে এ বাক্যের সম্পর্ক নিকটবর্তী দু'টি বাক্যের সাথেই রয়েছে। অর্থাৎ সৎকাজে অগ্রগামীরাই বড় অনুগ্রহের অধিকারী এবং তারাই এ জান্নাতগুলোতে প্রবেশ করবে। অন্যদিকে প্রথম দু'টি দলের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের পরিণামের কথা চিন্তা করে এবং নিজেদের বর্তমান অবস্থা থেকে বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। আল্লামা যামাখ্‌শারী এ অভিমতটি বলিষ্ঠভাবে বিবৃত করেছেন এবং ঈমাম রাযী একে সমর্থন দিয়েছেন।

কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সির বলেন, ওপরের সমগ্র আলোচনার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আর এর অর্থ হচ্ছে, এ তিনটি দলই শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কোনপ্রকার হিসেব-নিকেশ ছাড়াই বা হিসেব নিকেশের পর এবং সব রকমের জবাবদিহি থেকে সংরক্ষিত থেকে অথবা কোন শাস্তি পাওয়ার পর যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন। কুরআনের পূর্বাপর আলোচনা এ ব্যাখ্যার প্রতি সমর্থন দিচ্ছে। কারণ সামনের দিকে কিতাবের উত্তরাধিকারীদের মোকাবিলায় অন্যান্য দল সম্পর্কে বলা হচ্ছে, "আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন।" এ থেকে জানা যায়, যারা এ কিতাবকে মেনে নিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যারা এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসও এর প্রতি সমর্থন জানায়। হযরত আবুদ দারদা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী, বায়হাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ। হাদীসে নবী করীম (সা) বলছেন ঃ

فاما الذين سبقوا فاولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ، واما الذين اقتصدوا فاولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا ، واما الذين ظلموا انفسهم فاولئك يحبسون طول المحشر ثم هم الذين تتلقاهم الله برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن –

"যারা সৎকাজে এগিয়ে গেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে কোনরকম হিসেব-নিকেশ ছাড়াই। আর যারা মাঝপথে থাকবে তাদের হিসেব-নিকেশ হবে, তবে তা হবে হালকা। অন্যদিকে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদেরকে হাশরের দীর্ঘকালীন সময়ে আটকে রাখা হবে, তারপর তাদেরকে আল্লাহর রহমতের মধ্যে নিয়ে নেয়া হবে এবং এরাই হবে এমনসব লোক যারা বলবে, সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের থেকে দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।"

এ হাদীসে নবী করীম (সা) নিজেই এ আয়াতটির পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এখানে ঈমানদারদের তিনটি শ্রেণীর পরিণাম আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরেছেন। মাঝখানে অবস্থানকারীদের "হাল্‌কা জবাবদিহির" সম্মুখীন হবার অর্থ হচ্ছে, কাফেরদেরকে তো তাদের কুফরীর শাস্তি ছাড়াও তাদের প্রত্যেকটি অপরাধ ও গোনাহের পৃথক শাস্তিও দেয়া হবে। কিন্তু এর বিপরীতে ঈমানদারদের মধ্যে যারা ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের কাজ নিয়ে হাজির হবে তাদের সৎ ও অসৎ কাজগুলোর সম্মিলিত হিসেব-নিকেশ হবে। প্রত্যেক সৎকাজের জন্য আলাদা পুরস্কার ও প্রত্যেক অসৎ কাজের জন্য আলাদা শাস্তি দেয়া হবে না। আর ঈমানদারদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করবে তাদেরকে হাশরের সমগ্র সময়-কালে আটকে রাখা হবে—একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না বরং তাদেরকে আদালতের কার্যকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখার শাস্তি দেয়া হবে। অর্থাৎ হাশরের সমগ্র সময়-কাল (না জানি তা কত শত বছরের সমান দীর্ঘ হবে) তার পূর্ণ কঠোরতা সহকারে তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করবেন এবং আদালতের কাজ শেষ হবার সময় হুকুম দেবেন, ঠিক আছে, এদেরকেও জান্নাতে দিয়ে দাও। এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন উক্তি মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সাহাবী যেমন, হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত বারা'আ ইবনে আজেব (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সাহাবীগণ এহেন ব্যাপারে কোন কথা ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে পারেন না। যতক্ষণ না তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের মুখে তা শুনে থাকবেন।

কিন্তু এ থেকে একথা মনে করা উচিত নয় যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে "যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে" তাদেরকে কেবলমাত্র "আদালত সমাপ্তিকালীন" সময় পর্যন্ত আটকে রাখারই শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ জাহান্নামে যাবেই না। কুরআন ও হাদীসে বহুবিধ অপরাধের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এসব অপরাধকারীদের ঈমানও তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। যেমন যে মু'মিন কোন মু'মিনকে জেনে বুঝে হত্যা করে আল্লাহ নিজেই তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে উত্তরাধিকার আইনের আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা ভংগকারীদের জন্যও কুরআন মজীদে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। সূদ হারাম হবার হুকুম জারী হবার পর যারা সূদ খাবে তাদের জন্য পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, তারা আগুনের সাথি। এ ছাড়াও আরো কোন কোন কবীরাহ গোনাহকারীদের জন্যও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা জাহান্নামে যাবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

আর যারা কুফরী করেছে[৬২] তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের অস্তিত্ব খতম করে দেয়া হবে যাতে তারা মরে যাবে এবং না তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব কিছু কমানো হবে। এভাবে আমি প্রত্যেক কুফরীকারীকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। তারা সেখানে চিৎকার করে করে বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের এখান থেকে বের করে নাও, আমরা সৎকাজ করবো, আগে যে কাজ করতাম তা থেকে আলাদা।" (তাদেরকে জবাব দেয়া হবে এই বলে,) "আমি কি তোমাদের এতটুকু আয়ুষ্কাল দান করিনি যে সময়ে কেউ শিক্ষাগ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারতো?[৬৩] আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসে গিয়েছিল। এখন স্বাদ আস্বাদন করো, জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"

৫৮. সব ধরনের দুঃখ। দুনিয়ায় যেসব চিন্তা ও পেরেশানীতে আমরা লিপ্ত ছিলাম তার হাত থেকেও মুক্তি পাওয়া গেছে। কিয়ামতে নিজের পরিণাম সম্পর্কে যে দুশ্চিন্তা ছিল তাও খতম হয়ে যাবে এবং এখন সামনের দিকে অখণ্ড নিশ্চিন্ততা, সেখানে কোন প্রকার দুঃখ কষ্টের প্রশ্নই থাকে না।

৫৯. অর্থাৎ আমাদের অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং কর্মের যে সামান্যতম পুঁজি আমরা সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম তাকে বিপুল মর্যাদা ও মূল্যদান করে তার বিনিময়ে তাঁর জান্নাত আমাদের দান করেছেন।

৬০. অর্থাৎ দুনিয়া আমাদের আখেরাতের সফরের একটি মনযিল ছিল। এ মনযিলটি আমরা অতিক্রম করে চলে এসেছি। হাশরের ময়দানও এ সফরের একটি পর্যায় ছিল। এ পর্যায়ও আমরা পার হয়েছি। এখন আমরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখান থেকে বের হয়ে আর কোথাও যেতে হবে না।

৬১. অন্যকথায় আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ও কষ্টের অবসান ঘটেছে। এখন এখানে আমাদের এমন কোন কাজ করতে হবে না যা করতে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে এবং যা শেষ করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বো।

إِنَّ اللَّهَ عَٰلِمُ غَيْبِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৫ রুকূ'

নিসন্দেহে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত গোপন বিষয় অবগত, তিনি তো অন্তরের গোপন রহস্যও জানেন। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন।[৬৪] *এখন যে কেউ কুফরী করবে তার কুফরীর দায়ভার তার ওপরই পড়বে*[৬৫] *এবং কাফেরদের কুফরী তাদেরকে এ ছাড়া আর কোন উন্নতি দান করে না যে, তাদের রবের ক্রোধ তাদের ওপর বেশী বেশী করে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং কাফেরদের জন্য ক্ষতিবৃদ্ধি ছাড়া আর কোন উন্নতি নেই।*

৬২. অর্থাৎ আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

৬৩. এখানে এমন প্রত্যেকটি আয়ুষ্কালের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে মানুষ সত্য ও মিথ্যা এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে ফারাক করতে চাইলে করতে পারে এবং গোমরাহী ত্যাগ করে হিদায়াতের পথে পাড়ি দিতে চাইলেও দিতে পারে। এ বয়সে পৌঁছে যাবার আগে যদি কোন ব্যক্তি মরে গিয়ে থাকে তাহলে এ আয়াতের দৃষ্টিতে তাকে কোনপ্রকার জবাবদিহি করতে হবে না। তবে যে ব্যক্তি এ বয়সে পৌঁছে গেছে তাকে অবশ্যই তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আর তারপর এ বয়স শুরু হয়ে যাবার পর যতদিন সে বেঁচে থাকবে এবং সতর্কতার সাথে সহজ সরল পথে চলার জন্য যতই সুযোগ সে পেয়ে যেতে থাকবে ততই তার দায়িত্ব কঠিন হয়ে যেতে থাকবে। এমনকি যে ব্যক্তি বার্ধক্যে পৌঁছেও সোজা হবে না তার জন্য কোন ওজরই থাকবে না। একথাটিই একটি হাদীসে হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ যে ব্যক্তি কম বয়স পাবে তার জন্য তো ওজরের সুযোগ থাকে কিন্তু ৬০ বছর এবং এর বেশী বয়সের অধিকারীদের জন্য কোন ওজর নেই। (বুখারী, আহমাদ, নাসায়ী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম ইত্যাদি)

৬৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, পূর্ববর্তী প্রজন্ম ও জাতিদের অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁরপর এই পৃথিবীর বুকে তিনি তোমাদেরকে তাদের জায়গায় স্থাপন করেছেন। দুই, তিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করার যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمَٰوَٰتِ ۚ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

(হে নবী!) তাদেরকে বলো, "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাদের যেসব শরীককে ডাকো কখনো কি তোমরা তাদেরকে দেখেছো?[৬৬] আমাকে বলো, তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশসমূহে তাদের কি শরীকানা আছে?" (যদি একথা বলতে না পারো তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো) তাদেরকে কি আমি কোন কিতাব লিখে দিয়েছি যার ভিত্তিতে তারা (নিজেদের এ শিরকের জন্য) কোন সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র লাভ করেছে?[৬৭] না, বরং এ জালেমরা পরস্পরকে নিছক ধাপ্পা দিয়েই চলছে।[৬৮] আসলে আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে অটল ও অনড় রেখেছেন এবং যদি তারা টলটলায়মান হয় তাহলে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় আর কেউ তাদেরকে স্থির রাখার ক্ষমতা রাখে না।[৬৯] নিসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।[৭০]

তোমাদের এ জিনিসগুলোর মালিক হবার কারণে নয় বরং মূল মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের এগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

৬৫. যদি পূর্বের বাক্যের এ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, তোমাদেরকে তিনি পূর্ববর্তী জাতিদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন তাহলে এ বাক্যটির অর্থ হবে, যারা অতীতের জাতি সমূহের পরিণাম থেকে কোন শিক্ষাগ্রহণ করেনি এবং যে কুফরীর বদৌলতে জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে সেই একই কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে তারা নিজেদের এ নির্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করবেই। আর যদি এ বাক্যটির এ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করেছেন তাহলে এ বাক্যের অর্থ হবে, যারা নিজেদের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা ভুলে গিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে বসেছে অথবা যারা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী করেছে তারা নিজেদের এ বিদ্রোহাত্মক কর্মনীতির অশুভ পরিণাম ভোগ করবে।

৬৬. "তোমাদের শরীক" শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা তো আসলে আল্লাহর শরীক নয়, মুশরিকরা নিজেরাই তাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছে।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

তারা শক্ত কসম খেয়ে বলতো, যদি কোন সতর্ককারী তাদের কাছে আসতো তাহলে তারা দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির তুলনায় বেশী সৎপথের অনুগামী হতো।[৭১] *কিন্তু যখন সতর্ককারী তাদের কাছে এলো তখন তার আগমন তাদের মধ্যে সত্য থেকে পলায়ন ছাড়া আর কোন জিনিসের বৃদ্ধি ঘটায়নি। তারা পৃথিবীতে আরো বেশী অহংকার করতে থাকে এবং দুষ্ট চাল চালতে থাকে, অথচ দুষ্ট চাল তার উদ্যোক্তাদেরকেই ঘিরে ফেলে। এখন তারা কি পূর্বের জাতিদের সাথে আল্লাহ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তাদের সাথে অনুরূপ পদ্ধতিরই অপেক্ষা করছে?*[৭২] *যদি একথাই হয়ে থাকে তাহলে তুমি আল্লাহর পদ্ধতিতে কখ্খনো কোন পরিবর্তন পাবে না এবং কখ্খনো আল্লাহর বিধানকে তার নির্ধারিত পথ থেকে হটে যেতেও তুমি দেখবে না।*

৬৭. অর্থাৎ আমার লেখা এমন কোন পরোয়ানা কি তাদের কাছে আছে যাতে আমি একথা লিখে দিয়েছি যে, অমুক অমুক ব্যক্তিকে আমি রোগ নিরাময় বা কর্মহীনদের কর্মসংস্থান অথবা অভাবীদের অভাব পূরণ করার ক্ষমতা দিয়েছি কিংবা অমুক অমুক ব্যক্তিকে আমি আমার ভূপৃষ্ঠের অমুক অংশের কর্তৃত্ব দান করেছি এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের ভাগ্য ভাঙাগড়ার দায়িত্ব এখন তাদের হাতে কাজেই আমার বান্দাদের এখন তাদের কাছেই প্রার্থনা করা উচিত, তাদের কাছেই নজরানা ও মানত করা উচিত এবং যেসব নিয়ামতই তারা লাভ করে সে জন্য ঐ সব ছোট খোদাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এ ধরনের কোন প্রমাণপত্র যদি তোমাদের কাছে থাকে তাহলে তা সামনে হাজির করো। আর যদি তা না থাকে তাহলে তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, এসব মুশরিকী আকীদা–বিশ্বাস ও কর্মধারা তোমরা কিসের ভিত্তিতে উদ্ভাবন করেছো? তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, পৃথিবী ও আকাশে কোথাও তোমাদের এসব বানোয়াট উপাস্যদের আল্লাহর সাথে শরীক হবার কোন আলামত পাওয়া যায়? এর জবাবে তোমরা কোন আলামত চিহ্নিত করতে পারো না। তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, আল্লাহ কি

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

তারা কি পৃথিবীতে কখনো চলাফেরা করেনি, যার ফলে তারা তাদের পূর্বে যারা চলে গেছে এবং যারা তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল তাদের পরিণাম দেখতে পেতো? আকাশ মণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার মতো কোন জিনিস নেই। তিনি সবকিছু জানেন এবং সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী। যদি কখনো তিনি লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণসত্তাকে জীবিত ছাড়তেন না কিন্তু একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তারপর যখন তাদের সময় পুরা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নেবেন।

তাঁর কোন কিতাবে একথা বলেছেন অথবা তোমাদের কাছে বা ঐসব বানোয়াট উপাস্যদের কাছে আল্লাহর দেয়া এমন কোন পরোয়ানা আছে যা এ মর্মে সাক্ষ দেয় যে, তোমরা যেসব ক্ষমতা–ইখতিয়ার তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করছো আল্লাহ নিজেই তাদেরকে সেগুলো দান করেছেন? তোমরা এটাও পেশ করতে পারো না। এখন যার ভিত্তিতে তোমরা এ আকিদা তৈরি করে নিয়েছো সেটি কি? তোমরা কি আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মালিক, যার ফলে আল্লাহর ক্ষমতা ইখতিয়ার যাকে ইচ্ছা ভাগ বাটোয়ারা করে দিচ্ছো?

৬৮. অর্থাৎ এসব ধর্মীয় নেতা, পীর, পুরোহিত, গুরু, পণ্ডিত, মাশায়েখ ও দরগাহের খাদেম এবং এদের এজেন্টরা নিছক নিজেদের দোকানদারীর পসরা সাজিয়ে বসার জন্য জনসাধারণকে বোকা বানাচ্ছে এবং নানা গাল গল্প তৈরি করে লোকদেরকে মিথ্যা ভরসা দিয়ে চলছে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অমুক অমুক সত্তার শরণাপন্ন হলে তোমাদের দুনিয়ার সমস্ত কাজের সমাধা হয়ে যাবে এবং আখেরাতে তোমরা যতই গোনাহ নিয়ে হাজির হও না কেন তারা তা ক্ষমা করিয়ে নেবে।

৬৯. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত রাখার কারণেই এ সীমাহীন বিশ্ব–জাহান প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কোন ফেরেশ্‌তা, জিন, নবী বা অলী একে ধরে রাখছে না। বিশ্ব–জাহানকে ধরে রাখা তো দূরের কথা এ অসহায় বান্দারা তো নিজেদেরকেই ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে না। প্রত্যেকেই নিজের জন্ম ও স্থায়িত্বের জন্য মহান সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে একথা মনে করা যে, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারে তার কিছুটা অংশ আছে, নিছক বোকামী ও প্রতারণার শিকার হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

৭০. অর্থাৎ আল্লাহর সমীপে এত বড় গোস্তাখী করা হচ্ছে এবং এরপরও তিনি শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছেন না, এটা তাঁর নিছক সহনশীলতা ও ক্ষমাগুণের পরিচায়ক।

৭১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এবং কুরাইশরা বিশেষভাবে ইহুদি ও খৃষ্টানদের বিকৃত নৈতিক অবস্থা দেখে একথা বলতো। তাদের এ উক্তি ইতিপূর্বে সূরা আল আন'আমেও (১৫৬–১৫৭ আয়াত) উল্লেখিত হয়েছে এবং সামনে সূরা সাফ্‌ফাতেও (১৬৭–১৬৯ আয়াত) আসছে।

৭২. অর্থাৎ আল্লাহর এ আইন এদের ওপরও জারি হয়ে যাবে। যে জাতি নিজের নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে তাকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়া হবে।